স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ❑ সেপ্টেম্বর ২০১১

সম্পাদক

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক

ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক

ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

অক্ষরবিন্যাস ❑ রাখী হাজরা

প্রুফ সংশোধন ❑ সুচেতনা চক্রবর্তী

চিত্রাঙ্কন ❑ গোপাল সরকার

প্রচ্ছদ সহায়তা ❑ তরুণ বসু

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী

ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশিস কুমার কুন্ডু

ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্ত্তী

ডা. জ্যোতির্ময় সমাজদার ❑ ডা. প্রদীপ সাহা

ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়

ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত ❑ ডা. সোহম সরকার

ডা. তাপস মণ্ডল

বিনিময় মূল্য ২০ টাকা

প্রকাশক

স্বাস্থ্যের বৃত্ত

ফ্ল্যাট : এফ-৩, ৫০/এ কলেজ রোড

হাওড়া-৭১১১০৩

মুদ্রণ

প্রজ্ঞা প্রকাশনী, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয় ২

দাঁতের ব্যথায় ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায় ৩

জলাতঙ্ক রোগ ❑ ডা. সুমিত দাশ ৫

কাসারগোড়-এর 'অভিশাপ ❑ ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত ৮

বুকের ব্যথার ব্রহ্মজ্ঞান ❑ ডা. পার্থপ্রতিম পাল ১২

'হার্ট অ্যাটাক' হয়ে হাসপাতালে গেলে পরে ... ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী ১৫

অচেনা অন্ধকারে ❑ ডা. আশীষকুমার কুন্ডু ১৭

নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ ও আমাদের দেশ ❑ ড. শুভাশিস মুখোপাধ্যায় ১৯

স্মরণে : ডা. সুজিত কুমার দাশ ❑ ডা. পুণ্যব্রত গুণ ২৪

জরায়ুমুখের ক্যানসার কী ভাবে আটকাবেন ❑ ডা. চঞ্চলা সমাজদার ২৫

আলমা-আটা ছাড়িয়ে ভাবনা ❑ ডা. বিনায়ক সেন ২৮

রাহুল ❑ শ্রীলা দত্ত ৩৩

সম্পাদকীয়

কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে একেবারে ভাববেন না? ভাবুন, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও ভাবুন যে, আজ থেকে বছর বিশেক আগেও আপনাকে আপনারই স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবানোর জন্য এত ঝাঁ-চকচকে হাসপাতাল, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার, এত বিজ্ঞাপন ছিল না। তার মানে কি আপনি অথৈ জলে পড়ে ছিলেন? তা-ও নয়। তখনও পর্যন্ত ছিলেন পাড়ার ডাক্তার, যাঁকে আপনি চিনতেন ভালোমানুষ প্রতিবেশী হিসেবে, বাড়াবাড়ি হলে স্পেশালিস্ট ডাক্তার, যিনি দূরের লোক হলেও, লোকমুখে যাঁর সম্পর্কে আপনি ভালো-মন্দ জানতে পারতেন, আর নেহাত বাড়াবাড়ি হলে (প্রায় সব ক্ষেত্রেই সরকারি) হাসপাতাল, এই সবই আপনার হাতে ছিল।

সে সব এখন আদ্যিকালের কথা। হাতে সামান্য পয়সা থাকলেই শহুরে মানুষ আজ প্রথমে যায় স্পেশালিস্ট ডাক্তারের কাছে, আর তাঁকেই বেছে নেয়, যিনি কোনও নামকরা হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। তার পর যায় চকচকে কোনও হাসপাতালে। তার পর? পাড়ি দেয় দক্ষিণ ভারতের বা মুম্বইয়ের কোনও হাসপাতালে। এর মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচিতির মাধ্যমে কোনও ডাক্তারকে চেনার, বেছে নেওয়ার ভূমিকা ক্রমশ কমে আসছে, বাড়ছে বেসরকারি স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা। বেড়ে যাচ্ছে আপনার ব্যয়, আর বাড়ছে স্বাস্থ্য-পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের আয়।

এখন এমন একটা পরিবেশ, যেখানে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব আগের চাইতে ঢের বেশি। খবরের কাগজ থেকে স্বাস্থ্য-পত্রিকা, পাড়ার দেওয়াল থেকে টিভি চ্যানেল, সব কিছুতেই আপনি তাই দেখতে পান ওষুধ-হাসপাতাল-নার্সিংহোম-ডায়াগনোস্টিক সেন্টার ইত্যাদি বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। সরাসরি বিজ্ঞাপন তুলনায় ভালো, কেননা আপনি অন্তত বুঝতে পারেন বিজ্ঞাপনদাতা যেহেতু পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, তাঁর একটা উদ্দেশ্য হল, আপনার কাছ থেকে দু-পয়সা উপার্জন করা। কিন্তু মুশকিল হয় যখন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় নাম ভাঁড়িয়ে। আসলে বিজ্ঞাপন, কিন্তু আপনি দেখছেন খবর হিসেবে, বা নামকরা কোনও ডাক্তারের উপদেশ হিসেবে। আপনি স্বভাবতই সেটা সরল মনে বিশ্বাস করে বসবেন!

এই তো সেদিন ভোটের আগে নির্বাচন কমিশন বলল,' রাজনৈতিক দলগুলোর পয়সা খেয়ে বহু কাগজ ও টিভি চ্যানেল বিকৃত খবর ছাপছে। সেটা ঠিক নয়, তা ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে বিপদ। এ রকম চলবে না।' কিন্তু আপনার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার পক্ষে অনুরূপ বিপদ আটকানোর জন্য কোনো নির্বাচন কমিশন বা নাম-কা-ওয়াস্তে স্বাস্থ্য-কমিশনও নেই। সুতরাং, নিজেই সতর্ক থাকুন। বিজ্ঞাপনের গোরু গাছে চড়ে, আর ছুপা-বিজ্ঞাপনের গোরু সোনার ডিমও দেয়, তবে তা আপনাকে নয়, বিজ্ঞাপনের নেপথ্য নায়ককে।

আজ থেকে একশো বছর আগে বাংলা ভাষায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা নিয়ে বহু পত্র-পত্রিকা বের হত। সেগুলো এত চকচকে ছিল না। আর তখন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা আজকের মতো বিজ্ঞানসম্মত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সে কালের পত্রিকাগুলো তাদের সাধ্যমতো তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে তঞ্চকতা করত না। সে সময়ের সব কিছুই ভালো ছিল, এটা যারা বলে, তাদের সঙ্গে আমরা একমত নই। তবে আজকের চিকিৎসা-বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের সাধারণ কাঠামো ও জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আদান-প্রদান সংক্রান্ত তথ্য, সৎ ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার এবং সেটা সম্ভবও। এই বিশ্বাসের জায়গা থেকে স্বাস্থ্যের বৃত্তে আমাদের পথ চলা শুরু হল।

এক দিকে চিকিৎসক আর অন্য দিকে চিকিৎসিত -- এ দুইয়ের মাঝখানে সেতু **স্বাস্থ্যের বৃত্তে** বিজ্ঞান আর বিজ্ঞাপনের তফাৎ ঘোষণা নিয়ে কোনো আপস থাকবে না, আমাদের প্রথম প্রতিশ্রুতি এটুকুই।

দাঁতের ব্যথায়

ডা. শর্মিষ্ঠা রায়, বি. ডি. এস.

ছোটো মামাই বোধহয় আজকের বিকেলটা মাটি করে দেবেন। বাইরে ঝিম-ঝিম বৃষ্টি পড়ছে। রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁক ছ্যাঁক আওয়াজও আসছে। এই সন্ধ্যায় গুবলু-টুবলুদের দিদিমণি পড়াতে আসবেন না। ফোনও করে দিয়েছেন। শতরঞ্চি, তাকিয়া নিয়ে ওদের ন'ভাই-বোনের জমাটি মজলিশের মুখ্য আকর্ষণ হলেন ছোটোমামা ওরফে বঙ্কামামা। কিন্তু মাথায় যে তাঁর আজ কী চাপল তিনিই জানেন। বললেন, আজকের গল্পটা আমি নয়, রন্টাই বলবে।

লাফ দিয়ে উঠল রন্টাই। "মানে, কী বলতে চাও তুমি? বছরে দু-একবার আসো। এতগুলো ছেলেমেয়ে চারদিক ম্যানেজ করে ... আর তুমি?'' অভিমানে গলা বুজে এল রন্টাইয়ের। রুমাল দিয়ে গালটা চেপে ধরে আস্তে আস্তে মামা বললেন, "দাঁতে বড্ড ব্যথা।''

পাশের ঘরে সশব্দে টিভি চলছে। দাদু আজকাল কানে একটু কম শোনেন বলে টিভিটা বেশ জোরে চলে। বিজ্ঞাপনের বিরতি। একটা ছোট্ট মেয়ে মায়ের পাশে বসে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করছে, "ডাক্তারবাবু, আমার দাঁতও কি বাঘের মতো শক্ত হতে পারে?'' সঙ্গে সঙ্গে পুরো স্ক্রিন জুড়ে বাঘের দাঁতালো গর্জন। সহাস্য ডাক্তারবাবু দেখাচ্ছেন, কী ভাবে বিশেষ একটা কোম্পানির দাঁতের মাজন ব্যবহার করে প্লাস্টার প্যারিসের তৈরি মডেলও আখরোট ভেঙ্গে দেয়। মনমরা গুবলু আনমনে টিভি দেখতে দেখতে মামাকে বলল, "মামা, তুমিও তো ঐ পেস্টটা ব্যবহার করতে পারো। তোমার দাঁতও তো তা হলে বাঘের দাঁতের মতো শক্ত হয়।''

হঠাৎ, যেন দাঁতের ব্যথা ভুলে সোজা হয়ে বসলেন মামা, "বল তো দেখি, বাঘের দাঁতে ব্যথা হয় কি না?''

টুবলু বলল, "ব্যথা হবে না কেন? দাঁত থাকলে ব্যথা তো হবেই''। গুছিয়ে বসলেন মামা। "শোন তা হলে, কেন হয় দাঁতের ব্যথা।'' মুচকি হেসে রন্টাই চিমটি কাটল পিয়ালিকে। মানে, মামা ফর্মে এসে গিয়েছেন। ওদের অভিজ্ঞতা যে, না-ঘাঁটালে এই দাঁত-ব্যথা নিয়ে ফাটাফাটি গল্প শুনিয়ে দিতে পারেন মামা।

এত ক্ষণে কিন্তু ব্যথা-ট্যথা সব উধাও হয়ে গিয়েছে তাঁর। বললেন, "দাঁতের পোকা কথাটা কে কে শুনেছিস? হাত তোল।'' চটপট উঠে পড়ল সব ক'টা হাত। এবার মামার বিধান, "নে হাত নামা, বল, তোদের মধ্যে কে কে দাঁতের পোকা দেখেছিস।'' এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। সত্যিই তো, দাঁতের পোকা কেমন, কেউ তো দেখেনি। নিজের দাঁতেও নয়, ভাইবোনদের মধ্যেও নয়।

মামা বললেন, "দ্যাখ, দাঁতে ব্যথা বহু কারণে হয়। এক, কোনও আঘাত লেগে দাঁতে ব্যথা হতে পারে। দুই, তোরা সবাই জানিস, যখন মুখে নতুন দাঁত গজায়, তখন এক ধরনের ব্যথা হতে পারে। এটা সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় ১৮ বছর বয়সে, আক্কেল দাঁত উঠছিল, তখনকার কথা নিশ্চয়ই তোর মনে আছে। আরও একটা ব্যাপার হয়, শীতকালে বা ফ্রিজের ঠান্ডা জল খেলে কারও কারও দাঁত খুব কনকন করে। আর একটা ব্যাপার হল, ঠিক ভাবে দাঁত না-মাজার ফলে ময়লা জমে যদি মাড়ির সংক্রমণ হয়, তা হলে খাবার চিবিয়ে খাওয়ার সময় দাঁত ব্যথা করতে পারে।

কিন্তু এদের সকলকে ছাপিয়ে সবচেয়ে বড় সিংহাসনটা দখল করে যে বসে আছে, সে হল দাঁতের পোকা।

পিয়ালি আর থাকতে না-পেরে বলে ফেলল, "কিন্তু মামা, দাঁতের পোকা তো আমরা কেউ দেখিনি, তুমি কি দেখেছ কখনও?''

বেশ হিরো হিরো ভঙ্গি করে মামা বললেন, "দেখেছি, তোদেরও দেখাতে পারি।''

মুহূর্তে যেন সব স্তব্ধ হয়ে গেল। পিন পড়ার শব্দটাও শোনা যাচ্ছে। কে একটা ফিসফিস করে বলার চেষ্টা করল ‘‘আসলে পোকা বলে কিছু নেই ....’’ কিন্তু চতুর্দিকে এই সমবেত ‘‘হাঁ’’ করা মুখ যেন ওর সমস্ত কথা গিলে নিয়েছে।

গালের ওপর থেকে রুমালটা সরালেন মামা। বেশ ফুলে আছে গালটা। মামার ফোলা গালটা দেখে আঁতকে উঠল সবাই। ইস্, বোঝা যাচ্ছে, মামাকে এতটা বকানো ঠিক হয়নি ওদের। থাকগে, আবার শুরু করলেন মামা। ‘‘আজ যখন ট্রেনে আসছিলাম, দু-রকম দাঁতের পোকা তাড়ানোর ওষুধ কিনেছি। আসলে, নিজের দাঁতে ব্যথা ছিল বলেই বোধ হয় যা পেয়েছি, তাই কিনে নিয়েছি।’’

পকেট থেকে মামা বের করলেন একটা পুরিয়া আর একটা লাল রঙের শিশি। রন্টাই চিনতে পারল, ‘‘আরে, এ তো বিষহরি তেল, গালে মাখলেই নাকি ব্যথা কমে যায়। কিন্তু মামা, এটা তো বুজরুকি।’’

মামা হেসে পুরিয়াটা খুললেন, কী- রকম একটা সাদা রঙের গুঁড়ো। এটা দিয়ে দাঁত মাজলে নাকি পোকারা বেরিয়ে আসে। এই মুহূর্তে মামার দাঁতে তো পোকার আক্রমণ হয়েছে। ফলে, মামার ওপরেই তো পরীক্ষা করা যায়। একটা ছোটো প্লাস্টিকের গামলা নিয়ে বসলেন মামা, ওই পাউডার দিয়ে দাঁত মেজে কুলকুচি করে গামলায় ফেললেন। অদ্ভুত ভাবে দেখা গেল, সাদা সরু সরু কিলবিলে ‘পোকারা’ জলে ভেসে বেড়াচ্ছে।

প্রায় ম্যাজিক দেখার মতো অবস্থা ছেলেমেয়েগুলোর। দাঁতের ব্যথা চেপে রেখে হাসলেন মামা। বোধহয় ‘পোকা’ আবিষ্কারের আনন্দে।

---‘‘কী দেখলি? আসলে সবই ভুল। এগুলো তৈরি করা হয়েছে। কুমড়োর দানার শাঁস শুকিয়ে মিহি করে কেটে পাউডারের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওগুলোই দেখলি জলের মধ্যে।’’

রন্টাই এবার একটু জ্ঞান দেবার ঢঙে বলল, ‘‘দাঁতের পোকাগুলো আসলে ব্যাকটিরিয়া। একটা ম্যাগাজিনে দেখছিলাম।’’

মামা বললেন, ‘‘ঠিক বলেছিস। তুই যে খাবার খাস, তার মধ্যে প্রচুর শর্করা থাকে। আর এই শর্করার কিছু অংশ দাঁতে লেগে থাকে, যার সঙ্গে বিক্রিয়া করে ওই ব্যাকটিরিয়াগুলো অ্যাসিড তৈরি করে দাঁত ফুটো করে দেয়। আর এই ফুটো যখন দাঁতের শক্ত অংশ অতিক্রম করে নার্ভে পৌঁছয়, তখনই শুরু হয় ব্যথা।

এবার শোন, এই ব্যথা কত রকমের হয়? প্রথম দিককার ব্যথা খুব কষ্ট দেয়। প্রথমবার বাড়িতে ডাকাত পড়ার মতো লোকে খুব ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করে, অজ্ঞান হয়ে যায়। এই রকম আর কী! আর যে বাড়িতে রোজ চোর আসে, সেখানকার লোকেরা অভ্যস্ত হয়ে যায়। তাদের রাতের ঘুম নষ্ট হয় না। তেমনই, দাঁতের পুরোনো ব্যথাগুলো ওষুধ খেলেই কমে, কিন্তু নতুন ব্যথা ওষুধ খেলেও কমতে চায় না।’’

‘‘তা হলে, দাঁতে ব্যথা হলে আমরা কী করব মামা?’’ --- গুবলু মিন মিন করে বলল।

---‘‘কী আর করবি? ডাক্তারের কাছে যাবি, ডাক্তারবাবু অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দেবেন, ব্যথা কমানোর ওষুধ দেবেন, আর দরকারে তোর দাঁত তুলে দেবেন বা বাঁচানোর জন্য আর সি টি করতে বলবেন। খবরদার, বিজ্ঞাপনের খপ্পরে পড়ে উলটো-পালটা কাজ করিসনি যেন।’’

---‘‘আর তোমার মতো হলে? মানে ও রকম গাল ফুলে গেলে?’’

---‘‘আসলে আমার গল্পটা হল ওই বাড়িতে রোজ ডাকাত পড়ার মতো। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে বোধ হয় প্রথম ব্যথা হয়েছিল। পাত্তা দিইনি এত দিন। এখন ওই ফুটো দিয়ে জীবাণু ঢুকে দাঁতের গোড়ায় ঘা, পুঁজ বানিয়ে দিয়েছে। ওই দাঁত এখন তুলে ঘা পরিষ্কার করা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই।’’

জলাতঙ্ক রোগ

ডা. সুমিত দাশ,
এম. বি. বি. এস., ডি. পি. এম.

সে অনেক দিন আগের কথা। তখন আমি মেডিক্যাল কলেজে হাউসস্টাফশিপ করছি। আমাদের এক খ্যাপাটে গোছের সিনিয়র দাদা ছিল। শুনলাম হেল্‌থ সার্ভিস পরীক্ষার ইন্টারভিউতে গিয়ে বোমা ফাটিয়ে এসেছে। ওকে নাকি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ধরা যাক ওকে সুন্দরবনে কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চাকরি দেওয়া হয়েছে। বাঘে কামড়ানো রোগী এলে কী করতে হবে? ও নাকি উত্তর দিয়েছে, বাঘটাকে দশ দিন নজরে রাখতে হবে। খুব মজা পেয়েছিলাম কিন্তু তক্কে তক্কে ছিলাম ওকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করব বলে। সুযোগও পেয়ে গেলাম। একদিন হোস্টেল ক্যান্টিনে দেখলাম কেউ নেই। আর ওই দাদা লুচির ছোটোখাটো একটা পাহাড়কে আলুর দম দিয়ে ধ্বংস করছে। মুখে তৃপ্তির হাসি। এ কথা সে কথার পর একটু দোনামনা করেই জিজ্ঞাসা করলাম --- তোমার সম্পর্কে এই যে বাঘ নজরদারির গল্পটা আছে, সেটা কি সত্যি?

-- একদম বাজে কথা।

-- তার মানে তোমাকে বাঘে কামড়ানো নিয়ে কোনও প্রশ্ন করেনি?

-- হ্যাঁ, করেছিল তো।

--কী উত্তর দিয়েছিলে? আমি যেন একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখলাম।

ও একটা লুচি দিয়ে একটা আলুকে ফাঁদে ফেলতে ফেলতে খুব তাচ্ছিল্য ভরে বলল — আমি বলেছিলাম, বাঘটা বুনো না পোষা দেখতে হবে। আর ল্যাজটা গুটিয়ে দুপায়ের ফাঁকে ঢুকে গিয়েছে কি না দেখতে হবে। বোমা নয়, একেবারে অ্যাটম বোমা ফাটাল। অ্যাটম বোমা কেন বললাম, তা জানতে আমাদের এবার জলাতঙ্ক রোগের আলোচনায় ফিরতে হবে।

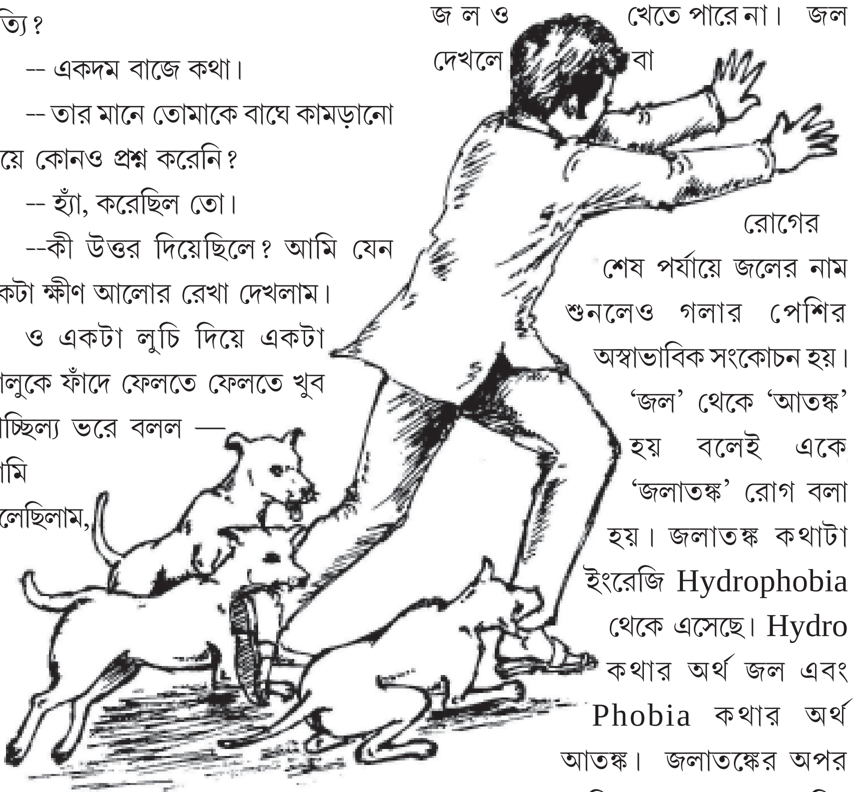

জলাতঙ্ক নাম কেন?

জলাতঙ্ক একটা ভাইরাস ঘটিত রোগ। আক্রান্ত ব্যক্তির সমস্ত দেহের মাংসপেশির অস্বাভাবিক সঙ্কোচন হয়। গলার পেশির সংকোচনের ফলে কোনও খাবার, এমনকী, জল ও খেতে পারে না। জল দেখলে বা রোগের শেষ পর্যায়ে জলের নাম শুনলেও গলার পেশির অস্বাভাবিক সংকোচন হয়। 'জল' থেকে 'আতঙ্ক' হয় বলেই একে 'জলাতঙ্ক' রোগ বলা হয়। জলাতঙ্ক কথাটা ইংরেজি Hydrophobia থেকে এসেছে। Hydro কথার অর্থ জল এবং Phobia কথার অর্থ আতঙ্ক। জলাতঙ্কের অপর নাম র‍্যাবিস (Rabies)। ল্যাটিন র‍্যাবিও (Rabio) কথার অর্থ পাগল হয়ে যাওয়া। এর থেকেই Rabies কথাটি এসেছে। গ্রীক ভাষা থেকে নেওয়া পুরোনো নাম Lyssa কথার অর্থও পাগলামো।

কার পাগলামি?

নামটার সঙ্গে পাগলামি জড়িয়ে আছে -- কার পাগলামির কথা বলা হচ্ছে? আমাদের দেশের শতকরা ৯৯ ভাগ রোগ পাগল কুকুরের কামড় থেকে হয়। এ ছাড়া বেড়াল, বাদুড়, নেকড়ে, কাঠবেড়াল, ভালুক, বেজি, বানর, শেয়াল ইত্যাদি বন্য বা পোষা যে কোনও জন্তুর কামড় থেকেই জলাতঙ্ক রোগ হতে পারে, যদি ওই প্রাণীর লালায় জলাতঙ্কের ভাইরাস থাকে। একটা কুকুরকে অন্য কোনও জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত কুকুর বা অন্য প্রাণী কামড়ালে ১০ দিন থেকে ৮ মাসের মধ্যে রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পায়। তবে, সাধারণত গড়ে ১৪ দিন সময় লাগে। আক্রান্ত কুকুরটা অস্বাভাবিক আচরণ করে। এই আচরণ দু'-রকমের হতে পারে।

(ক) উন্মত্ত বা ফিউরিয়াস র‍্যাবিস : কুকুরটার চালচলন অস্বাভাবিক হয়ে যায়। এ দিক-ও দিক উদ্দেশ্যহীন ভাবে ছুটে বেড়ায়। হঠাৎ বিনা প্ররোচনায় তেড়ে এসে কামড়াতে পারে। খাদ্য-অখাদ্যের জ্ঞান থাকে না— মাটি, ইট, জুতো, বই, যা পারে খাওয়ার চেষ্টা করে। মুখ দিয়ে অবিরাম লালা ঝরে, যে

লালাতে র‍্যাবিস ভাইরাস থাকে। মুখ দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ করে। পরে সেটাও পারে না। পক্ষাঘাতে পা- গুলো দুর্বল হয়ে পড়ে, শরীরের ভারসাম্য থাকে না। ল্যাজ গুটিয়ে যায়। অবশেষে মৃত্যু। রোগ -প্রকাশের পরে সাধারণত ৪-৭ দিন বাঁচে, তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ১০ দিন পর্যন্ত বাঁচে।

(খ) মৌন বা ডাম্ব র‍্যাবিস : এই অবস্থায় কুকুরটা নিস্তেজ ও আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। বিকৃত স্বরে ধীরে ধীরে ডাকে। মানুষের চোখের আড়ালে থাকতে চায়। খাটের নীচ বা অন্য কোনও অন্ধকার স্থান খুঁজে নেয়। শরীরে দ্রুত কাঁপুনি ও পক্ষাঘাত দেখা যায়। সাধারণত রোগ-লক্ষণ প্রকাশের ২-৭ দিনের মধ্যে কুকুরটা মারা যায়।

সাধারণতঃ, রোগ-লক্ষণ প্রকাশের ৫ দিন আগে থেকে কুকুরটার লালায় র‍্যাবিস ভাইরাস আসতে শুরু করে। আর রোগ-লক্ষণ প্রকাশের ৫ দিনের মধ্যে কুকুরটার মৃত্যু হয়। তাই দশ দিনের নজরদারির কথা বলা হয়। মুশকিল হচ্ছে, রাস্তার কুকুর বা অন্য বন্য জন্তুর ক্ষেত্রে এই নজরদারি সম্ভব হয় না। চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেগুলো বিবেচনা করতে হয়। রোগের প্রকাশ প্রতিরোধ করতে হবে যে কোনও ভাবেই।

রোগের প্রকাশ কত দিনে হয়?

কুকুরটা কোথায় কামড়েছে, কতটা ভয়ঙ্কর ভাবে কামড়েছে, তার ওপর অনেকটা নির্ভর করে রোগ-প্রকাশের সময়কাল। জলাতঙ্কের ভাইরাস প্রথমে কামড়ানোর জায়গায় পেশিতে বংশবৃদ্ধি করে। তার পর খুব ধীর গতিতে, ঘন্টায় ২-৫ মি.মি. গতিতে স্নায়ুপথ ধরে মস্তিষ্কে পৌঁছোয়। এর পরে আবার রক্তের মাধ্যমে অন্যান্য প্রান্তীয় স্নায়ুকেও আক্রমণ করে। তাই শরীরের উপরের অংশে কামড়ালে, মস্তিষ্ক খুব কাছে হওয়ার দরুণ রোগের প্রকাশ তাড়াতাড়ি হয়। সাধারণ ভাবে মানুষের ক্ষেত্রে ৩-৮ সপ্তাহ লাগে রোগ প্রকাশ পেতে। তবে কামড়ানোর ৪ দিন পর থেকে ১ বছর পরেও রোগের প্রকাশ হতে দেখা গিয়েছে। বিরল ক্ষেত্রে ২০ বছর বাদেও রোগের প্রকাশ হওয়ার নজির রয়েছে।

জলাতঙ্কে আক্রান্ত মানুষের রোগ লক্ষণ

শুরুতে আক্রান্ত মানুষের গা-ম্যাজম্যাজ করে, সামান্য জ্বর হয়। শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ রোগী কামড়ানোর জায়গায় চিনচিনে ব্যথা অনুভব করে। যেহেতু স্নায়ুগুলো তাদের স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে ফেলে, তাই শরীরের বিভিন্ন পেশিতে দীর্ঘকালীন যন্ত্রণাদায়ক খিঁচ ধরে। শরীর বেঁকে যায়। আগেই বলা হয়েছে, গলার পেশিতে খিঁচ ধরার জন্য রোগী জল বা অন্য খাবার গিলতে পারে না। চোখে আলো পড়লে ভীষণ কষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত হৃদযন্ত্র বা শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু হয় ৩-৫ দিনের মধ্যে।

জলাতঙ্ক রোগ কি সারে?

সত্যি কথা বলতে কি জলাতঙ্ক রোগ একবার হলে সারে না--- মৃত্যু অনিবার্য (যদিও এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে দু'জন জলাতঙ্কে আক্রান্ত মানুষ বেঁচে গিয়েছে বলে নজির রয়েছে)। ১৯৯৯ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, সারা পৃথিবীতে ৩৭ হাজার মানুষ জলাতঙ্ক রোগে মারা গিয়েছে। তার মধ্যে ভারতবর্ষে ৩০ হাজার মানুষ -- এখানেও আমরা এক নম্বর। ভারতে প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষকে জলাতঙ্ক রোগের টিকা দিতে হয় প্রতি বছর।

রোগ ছড়ায় কী ভাবে?

জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত প্রাণীর, বিশেষ করে কুকুরের কামড় থেকেই রোগটা ছড়ায়। এদের লালায় মিশে থাকা ভাইরাস এ রোগের কারণ। এ ছাড়া আক্রান্ত কুকুর যদি ক্ষতযুক্ত চামড়া অথবা শ্লেষ্মাঝিল্লিযুক্ত অংশ চেটে দেয়, রোগ হতে পারে। এক ধরনের গুহাবাসী বাদুড়ের ক্ষেত্রে বায়ুর মাধ্যমে শ্বাসের সঙ্গে ও এই ভাইরাস ছড়াতে দেখা গিয়েছে। আক্রান্ত মানুষ থেকে অন্য মানুষে ছড়ানো বিরল হলেও সম্ভব। একটা আক্রান্ত বাচ্চা তার বাবা- মাকে কামড়ে দেওয়ায় জলাতঙ্কের নজির রয়েছে।

কুকুরে কামড়ানোর প্রাথমিক চিকিৎসা

যেহেতু জলাতঙ্ক রোগ একবার হলে মৃত্যু অনিবার্য, তাই রোগ প্রতিরোধটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। যে জায়গাটাতে কুকুরে কামড়েছে, সে জায়গাটা জল ও সাবান দিয়ে খুব ভালো ভাবে ধুতে হবে। খুব ভালো হয়, যদি প্রবাহিত জলের ধারায় (যেমন ট্যাপের জল) অন্তত ১৫ মিনিট ধোয়া যায়। সাবান না-পেলে অন্তত শুধু জলেও ধুতে হবে। দুঃখজনক ভাবে এই নির্দেশটা অধিকাংশ মানুষ জানেন না বা মানেন না। শুধু ধুয়েই ক্ষতস্থান থেকে অনেকটা ভাইরাস দূর করে দেওয়া যায়। আগে ক্ষতস্থানে স্যাভলন বা ডেটল ব্যবহার করা হত, এখন হয় না। কোনও অবস্থাতেই যেন ব্যাণ্ডেজ না-করা

হয়। বাড়িতে বা স্থানীয় ভাবে এ টুকু করে রোগীকে দ্রুত ডাক্তারখানায় বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে, যেখানে ক্ষতস্থানের অন্য চিকিৎসা ও টিকাকরণের ব্যবস্থা করা যাবে।

আর একটা ছোটো ঘটনা বলে লেখাটা শেষ করব। আমি সিকিমে জুলুখ নামের একটা জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। অসাধারণ পাহাড়ি জায়গা। একদিন পাহাড়ের নীচে নামছি, সঙ্গ নিল একটা সুন্দর লোমশ পাহাড়ি কুকুর। সে লাফাচ্ছে-ঝাঁপাচ্ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে। দারুণ ফূর্তিতে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। ফেরার সময় একই ভাবে লাফাতে লাফাতে ফিরল। এবার ঘরে যাব, ও যেতে দেবে না। প্রথমে পা জড়িয়ে ধরল। আমি জোর করে ছাড়াতে গেলাম, কামড়ে দিল। ওর মধ্যে এমনিতে র‍্যাবিসের কোনো লক্ষণ নেই। খবর পেলাম ও টুরিস্টদের সঙ্গে এ রকম খেলা করে। কিন্তু আমার পক্ষে ওখানে বসে কুকুরটাকে ১০ দিন নজরে রাখা সম্ভব নয়। বাড়িতে এসে বিরস বদনে প্রথম ইঞ্জেকশনটা নিলাম। আর তার পরই আমাদের সম্পাদকের ফোন এল জলাতঙ্ক নিয়ে লিখতে হবে। সমাপতন? নাকি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা?

আমাকে এখন আরও চারটে ইঞ্জেকশন নিতে হবে। তবু ভাগ্য ভাল কুকুরটা পাগল নয়, বা কুকুরটা আমার মুখ বা মাথায় কামড় বসায় নি -- তাহলে আমাকে বেশ দামি কয়েকটা ইঞ্জেকশন নিতে হত -- তাকে বলে হিউম্যান রেবিস ইমিউনোগ্লোবিউলিন। কমের ওপর দিয়েই এবার ফাঁড়াটা কাটল বলতে হবে!

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ডা. অভিজিৎ পাল, এম.ডি.

Acne, Hair Fall, Vitiligo – Do **NOT** Despair.

All are Treatable.

Consult your Dermatologist

ALKEM DERMA CARE

(Adding Value to Skin Care)

A Division of **Alkem** Laboratories Ltd

কাসারগোড় -এর 'অভিশাপ'

ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত, এম. বি. বি. এস., ডি. সি. পি., এম. ডি.

"ভূগর্ভ বিষ ফসলের দেহে ঢোকে
ও মেয়ে তোদের শরীরে শরীরে যায়
দূরে বসে কেউ বন্ধ্যা করেছে তোকে
তুই ভেবেছিস মাটিরই তো সব দায় --"
---- মা নিষাদ
জয় গোস্বামী

'ধপ', ধপ, 'ধপ' — ১২ বছরের রিশানা তার বিশাল মাথাটা ইটের দেওয়ালে ঠুকছে--ঠুকেই যাচ্ছে। দু-চোখ থেকে জলের স্রোত বইছে গাল বেয়ে। জন্ম থেকেই ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়া মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা, যা সাধারণ ব্যথার ওষুধে কমে না। রিশানা স্কুলে যায় না। বিরাট মাথা নিয়ে দুর্বল রোগা শরীরে টলমল করে দু'-এক পায়ের বেশি হাঁটতেও পারে না। মাঝে মাঝেই সারা শরীরে খিঁচুনি হয়। বাবা-মা নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। হাইড্রোসেফালাসে (মস্তিষ্কে জল জমে যাওয়া) আক্রান্ত রিশানাকে অস্ত্রোপচার করে কিছুটা কষ্ট দূর করার মতো আর্থিক সঙ্গতি তাঁদের নেই।

'ঈশ্বরের নিজস্ব বাসভূমি' -- কেরল। তার উত্তর সীমান্তে একটা জেলা কাসারগোড়। রিশানার মতোই চলৎশক্তিহীন, বিকলাঙ্গ প্রতিবন্ধী জীবনযাপন করছে আরও ৪২৭৩ জন বিভিন্ন বয়েসি মানুষ। বড়লোকদের জলখাবারের থালায় তুলে দিতে হবে কাজুবাদাম। সেই কাজু চাষ করার জন্য, আরও বেশি ফলনের জন্য, গত ২২ বছর ধরে নির্বিচারে ক্ষেতে ক্ষেতে ছড়ানো হয়েছে এক ভয়াবহ বিষ কীটনাশক। তারই প্রতিক্রিয়ায় আজ কাসারগোড়ের ঘরে ঘরে বিকলাঙ্গ শিশু-কিশোর-যুবক-যুবতীর অন্তহীন মিছিল। কী সেই হলাহল? নাম এন্ডোসালফান (Endosulfan)। বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তিন হাজারেরও বেশি বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছেন যন্ত্রণায়। কোনো পরিবারের চার-পাঁচ জন সদস্য— কারোরই বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতা নেই। গর্ভে সন্তান এলে মায়েরা বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দেবেন না বলে চোখের জল ফেলতে ফেলতে গর্ভপাত করান। আর কী বলছে সরকার বাহাদুর? "এন্ডোসালফান সস্তা, এ দেশে তৈরি হয়। তাই কীটনাশক হিসাবে এর জুড়ি নেই। নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে কৃষিপণ্যের দাম বেড়ে যাবে, ব্যবসা মার খাবে।" হায়! "শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়" -- সত্যিই আমাদের মূক করে রাখে।

কী এই এন্ডোসালফান (Endosulfan) ?

এন্ডোসালফান হল ১৯৫০ সালে বেয়ার আবিষ্কৃত অরগ্যানোক্লোরিন (Organochlorin) গোষ্ঠীর এক কীটনাশক, যা শাক-সবজি, ফল, ধান, তুলো, কাজু, চা, কফি, তামাক ও অন্যান্য ফসল উৎপাদনে বিপুল ভাবে ব্যবহার করা হয়। এই রাসায়নিক বহু ধরনের পতঙ্গকে (অনেক উপকারী পতঙ্গ কেও, যারা পরাগসংযোগে সহায়তা করে) মেরে ফেলে। জলে মিশলে মারা পড়তে পারে মাছ, শামুক ও অন্যান্য জলজ প্রাণী।

১৯৫৪ সালে হেক্স্ট এজি (যার নাম এখন বেয়ার ক্রপ সায়েন্স) মার্কিন ড্রাগ অথরিটির (USDA) অনুমোদন পেয়ে সারা বিশ্বজুড়ে এই রাসায়নিকের ব্যবসায় নামে। ক্রমে ক্রমে এটাই হয়ে ওঠে নানা ফসলের ক্ষেত্রে প্রধান কীটনাশক। পরে বেয়ার কোম্পানির মেধাসত্ত্ব বা পেটেন্ট চলে গেলে, নানা সংস্থা এই কীটনাশক উৎপাদন করতে থাকে। আটের দশক পর্যন্ত মনে করা হত, এটা অন্যান্য কীটনাশকের চেয়ে নিরাপদ।

নব্বইয়ের দশক থেকেই প্রাণী ও মানবদেহে এর ভয়াবহ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জনসমক্ষে আসতে থাকে। দেখা যায়, মানবদেহে এন্ডোসালফানের প্রভাব মারাত্মক। চাষের জন্য ক্ষেতে এই কীটনাশক ছড়ালে, তা খাদ্যশৃঙ্খল (Food Chain)-এ ঢোকে, শাক-সবজি, ফল বা শস্যের মধ্যে ঢুকে যায় এবং আমরা যখন ওই সব শাক-সবজি বা শস্য খাই, তখন আমাদের শরীরে ঢোকে। বর্ষার জলে ধুয়ে গিয়ে পানীয় জলের উৎসকে দূষিত করে। চাষিদের বা যারা উৎপাদনের কারখানায় কাজ করে, তাদের হাতে লেগে থাকে ও মুখ দিয়ে শরীরে যায়। মায়ের দুধও বিষিয়ে যায়, কীটনাশক ছড়িয়ে পড়ে শিশুর দেহে। এমনকী, মাটি বা ধুলো নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরে ঢুকলে বা এন্ডোসালফান দেওয়া হয়েছে, এমন জমিতে উৎপন্ন তামাক গ্রহণ করলেও বিষক্রিয়া হয়। এমনই ভয়াবহ এই রাসায়নিক। বর্তমানে বিশেষজ্ঞদের মতে, এখন যত কীটনাশক ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে এন্ডোসালফান সবচেয়ে তীব্র বিষ।

মার্কিন পরিবেশ দফতর (EPA) ২০০০ সালে এর ব্যবহার দেশে নিষেধ করে। তাদের মতে এটি '১ খ' তালিকা-যুক্ত তীব্র বিষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অবশ্য একে '২' নং তালিকায় রেখেছে। উভয়ের মতেই এটা একটা 'দীর্ঘস্থায়ী জৈব দূষণ সৃষ্টিকারী' (Persistent Organic Pollutant বা POP) বস্তু। বাতাসের সাহায্যে এক দেশের সীমানা ছাড়িয়ে তা ছড়িয়ে পড়তে পারে পাশের দেশে। তাই এটা Long-Range Transbounday Air Pollutant (LRTBAP) গোষ্ঠীভুক্তও বটে। এর বিক্রিয়াজনিত পদার্থগুলি (Breakdown Products) আরও দীর্ঘ দিন প্রকৃতিতে থেকে যায়।

বিষক্রিয়া

১। আকস্মিক তীব্র (Acute) বিষক্রিয়া—

শ্বাসপ্রশ্বাসের সাহায্যে বা চামড়ার মধ্যে দিয়ে বেশি মাত্রায় শরীরে ঢুকলে এই রাসায়নিক দ্রুত মৃত্যু ঘটাতে পারে।

- স্নায়ুতন্ত্র — উত্তেজনা, তড়কা, আচ্ছন্ন-ভাব, ভুল কথা বলা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, স্মৃতিলোপ, দৃষ্টি ঝাপসা, ঘুম না-হওয়া।
- শ্বাসতন্ত্র — প্রশ্বাসে কষ্ট থেকে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া, ফুসফুসে জল জমা।
- পরিপাকতন্ত্র — পাতলা পায়খানা, বমি, পেটে তীব্র যন্ত্রণা, খিদের অভাব, গলা শুকিয়ে যাওয়া।
- অন্যান্য — তীব্র মাথা যন্ত্রণা, প্রস্রাব কমে যাওয়া ও তাতে রক্তপাত হওয়া ইত্যাদি।

২। দীর্ঘকালীন (Chronic) বিষক্রিয়া

(ক) এন্ডোসালফানের রাসায়নিক গঠন নারীদের যৌন হরমোন ইস্ট্রোজেনের মতো হওয়ায় তা অল্পবয়েসি ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকালীন (Pubertal) যৌনতার বিকাশে বাধা দেয়। ফলে, তাদের অণ্ডকোষ ও জননাঙ্গ পুষ্ট হয় না। শিশুরা অণ্ডকোষ ছাড়াও জন্মাতে পারে। পুরুষ যৌন হরমোন টেস্টোস্টেরন (Testosterone) শরীরে তৈরি হওয়ায় বাধা দেয় এই রাসায়নিক। বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা কমে যায়। নারীদেহের ঋতুচক্র ও গর্ভধারণের নানা সমস্যা হয়।

(খ) **জন্মগত বিকলাঙ্গতা –**

বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এই রাসায়নিক ক্রোমোজোমের ক্ষতি করতে পারে, যা আমাদের বংশগতির অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বংশাণু (Gene) -কে ধারণ করে। ফলে, বিকলাঙ্গ শিশুর (Teratogenecity) জন্ম হয়। বিশেষত নারী ও পুরুষদেহে জননাঙ্গের বহু বিকৃতি দেখা যায়— যেমন হয়েছে কেরালার কাসারগোড়ে দীর্ঘকালীন দূষণের জন্য।

(গ) **স্নায়ুতন্ত্র**

জড়বুদ্ধি শিশু জন্মানো, নানা স্নায়বিক বিকৃতি (যেমন Autism) এবং Cerebral Palsy নামক রোগ হতে পারে। এই সব রোগের কোনও চিকিৎসা নেই। Cerebral Palsy -তে হাত, পা, ঘাড় প্রভৃতি শক্ত হয়ে থাকে এবং স্বাভাবিক হাঁটা-চলা, কাজকর্ম কোনও কিছুই করা যায় না। জন্মগত ভাবে মূক,বধিরতা এবং অন্ধত্বও ঘটে।

(ঘ) **ক্যানসার**

এন্ডোসালফান থেকে ক্যানসার হয় কি না, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে সাধারণ মত হল, দীর্ঘ দিন ধরে দূষণে আক্রান্ত মানুষদের মধ্যে ক্যানসার হতে পারে। মহিলাদের স্তনে ক্যানসার হওয়ার অনেক রিপোর্ট রয়েছে এন্ডোসালফান-আক্রান্ত এলাকায়।

এ ছাড়াও, এই রাসায়নিকে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা (Immunity) ভেঙে পড়ে। সহজেই সংক্রমণ ঘটে। এই কীটনাশকের ভয়ংকর দিক হল Bioaccumulation, অর্থাৎ দীর্ঘ দিন ধরে তা নষ্ট হয় না, পরিবেশে জমে থাকে এবং ক্রমশঃ দূষণের মাত্রা বাড়ে।

আবার কাসারগোড়

আক্রান্ত গ্রামগুলিতে সহজেই চোখে পড়বে বিকলাঙ্গ শিশুদের --- বিরাট মাথা, বাঁকা

হাত-পা, ভাবলেশহীন মুখ। বেল্লর গ্রামের কৃষিজীবী গণেশ রাও। তাঁর ১৬ বছরের মেয়ে সোমাইয়া, ১৪ বছরের ছেলে অরুণ, দু'জনেই জন্ম থেকে বোবা, কালা ও অন্ধ। অরুণ সেরেব্রাল পলসি (Cerebral Palsy) -তেও আক্রান্ত। কেবল বাবা-মা'ই বোঝেন, কখন তাদের খিদে পেয়েছে। সকালে দু'জনকে একতাল মাংসের মতো তাদের মা লক্ষ্মীবাঈ উঠোনে বসিয়ে দেন। তারা বসে থাকে, বসেই থাকে। মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে অবোধ্য শব্দ করে। রোদের ঝাঁঝ বাড়লে তাদের তুলে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘরের কাজে ব্যস্ত লক্ষ্মীবাঈ কখনও তাদের তুলতে ভুলে গেলে ঠা-ঠা রোদে পড়ে থাকে জড়বুদ্ধি দেহদু'টি।

১৯১০ সালে তিন দিনের সমীক্ষায় এই ধরনের আক্রান্তের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছিল ৪২৭৩ জন, যারা সামান্য সরকারি অনুদান পায়। কিন্তু স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের মতে, আসল সংখ্যাটা ১৫ হাজারেরও বেশি। অনেকেই দূর গ্রাম থেকে, পাহাড়ি অঞ্চল থেকে রাস্তাঘাটের অভাবে বিকলাঙ্গ পরিজনদের নিয়ে ওই তিন দিনের স্বাস্থ্য শিবিরে এসে নাম নথিবদ্ধ করাতে পারেননি। আবার বহু মানুষ নানা দৈহিক সমস্যার কথা বললেও, সরকারি চিকিৎসকরা আক্রান্তের সংখ্যা কম দেখানোর জন্য তাঁদের নাম তালিকা-ভুক্ত করেননি বলে অভিযোগ।

১৯৭৮ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত কেরালা বাগিচা চাষ নিগম (Plantation Corporation of Kerala) লাগাতার ভাবে চা, কফি ও কাজু ক্ষেতের উপর হেলিকপটার থেকে ওই এন্ডোসালফান ছড়িয়ে গিয়েছে। ১৯৯০ সালে ওই সব বাগিচা চাষ এলাকার আশেপাশে যাঁরা বাস করতেন, তাঁরা দেখতে পান, অস্বাভাবিক এবং জড়বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুর সংখ্যা বাড়ছে। তখনই কেউ ওই কীটনাশককে দায়ী করেনি, কিন্তু সন্দেহ তীব্র হচ্ছিল। ১৯৯৮ সালে রাজ্য কৃষি দফতরের কর্মী লীলাকুমারী আম্মা, কাঞ্জন গাড়ু মুন্সেফ আদালতে, পেরিয়া ব্লকে ওই ভাবে আকাশ থেকে কীটনাশক ছড়ানোর বিরুদ্ধে একটা মামলা করেন ও স্থগিতাদেশ পান। তখন থেকেই জনমত তীব্র হতে থাকে। লড়াই শুরু হয় বাগিচা মালিকদের সঙ্গে নিরক্ষর বাগিচা শ্রমিক ও গ্রাম-বাসীদের। ক্রমে তাঁরা জানতে পারেন, ওই সব হেলিকপটারের বহিরাগত চালকপ্রবর ওই অঞ্চলে একফোঁটাও জল বা খাবার খান না। বাগিচার ম্যানেজার তাঁর পরিবারকে কীটনাশক ছড়ানোর মাসগুলোতে (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি) দূরে শহরে পাঠিয়ে দেন। মাত্র ৫০ মিটার উপর থেকে স্প্রে করে দেওয়া হয় এই কীটনাশক --- যা কাজু ক্ষেত ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে নদনদী, পাতকুয়ো, বাস্তুভিটেতেও। ২০০০ সালের ডিসেম্বরে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ প্রতিবাদ মিছিল করে হেলিকপটারের উড়ান আটকে দেন। এর পর থেকেই বাড়তে থাকে প্রতিবাদ। সংবাদমাধ্যমেরও নজর পড়ে। আদালতে নিষিদ্ধ হয় আকাশ থেকে কীটনাশক ছড়ানো। ২০০২ সালে কেরালা হাইকোর্ট এন্ডোসাল-ফানের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। কিন্তু পরে আবার উৎপাদকদের চাপে তা প্রত্যাহৃত হয়।

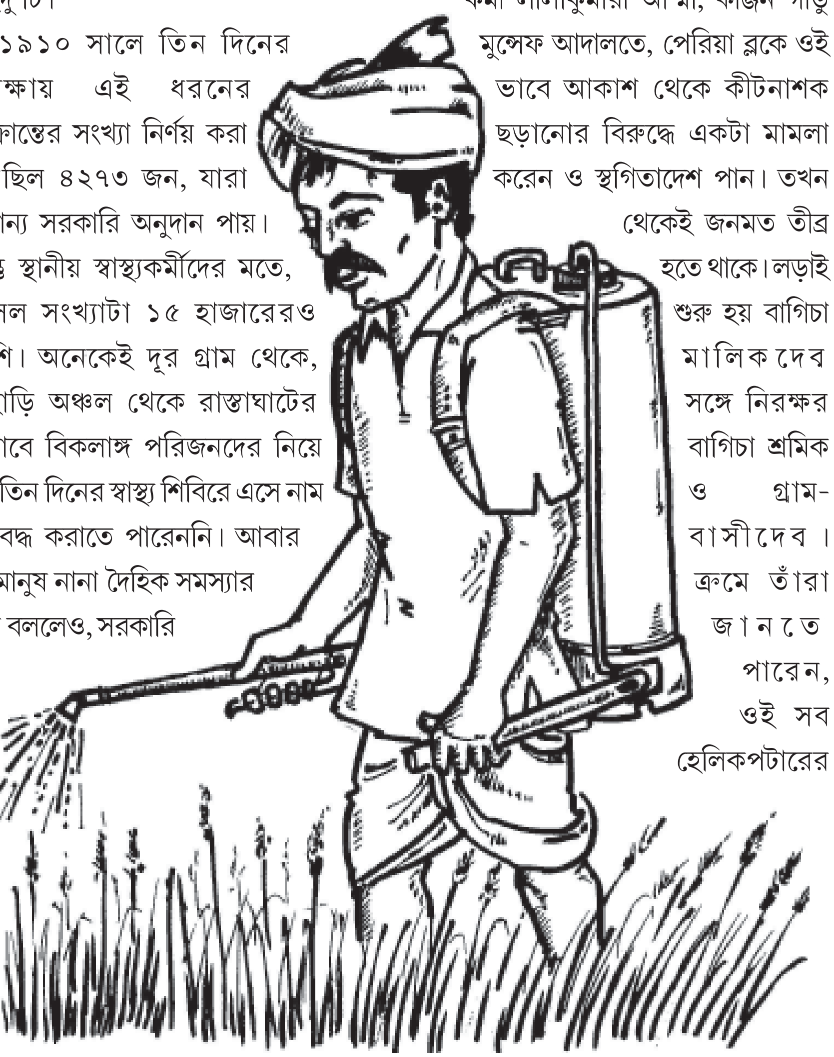

'পাপের ফসল' এখনও ফলছে। নিষিদ্ধ হওয়ার ১০ বছর পরও স্থানীয় মানুষদের রক্ত পরীক্ষা করে কালিকট মেডিক্যাল কলেজ জানায়, রক্তে ওই রাসায়নিকের মাত্রা অস্বাভাবিক বেশি। প্রতি সপ্তাহে কাসারগোড়ে অন্তত এক জন এই বিষক্রিয়ায় মারা যান। পুরো জেলাতে এন্ডোসালফানে আক্রান্তদের চিহ্নিত করা ও তাঁদের চিকিৎসার জন্য কোনো স্বাস্থ্য-পরিষেবা নেই। স্থানীয় হাসপাতালের পরিকাঠামো কহতব্য নয়। আর নিকটতম বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসার হাসপাতাল ১০০ কিলোমিটার দূরে। এলাকাটা পাহাড়ি হওয়ায়, রোগীরা সেই হাসপাতালে পৌঁছতেই পারেন না। রাস্তা নেই। প্রতিদিন নতুন নতুন আক্রান্ত মানুষ চিহ্নিত হচ্ছেন। সম্প্রতি কেরালার ইডুক্কি ও পালাক্কাড জেলায় এবং কর্ণাটকের ভাটকালা জেলাতেও এমন অনেক রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাসারগোড়ে বহু রোগী চিহ্নিত হননি। বিশেষত মহিলারা। বহু আক্রান্ত মানুষ বাড়ির অন্ধকার কোণে, নির্জীব পদার্থের মত

পড়ে রয়েছেন। বহু মহিলা গোপনে গর্ভপাত করান। নিকটবর্তী আজানুর অঞ্চলে অনেক জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুর সন্ধান পাওয়া গেলেও কোনও সমীক্ষা হয়নি।

নিষিদ্ধ করার দাবি

ভারতবর্ষ এন্ডোসালফানের সবচেয়ে বড় উৎপাদক। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৬০ শতাংশই এখানে। মোট ব্যবসা বছরে ১০০০ কোটি টাকার বেশি। সবচেয়ে বেশি রফতানিকারকও এই দেশ।

উৎপাদক সংস্থাগুলো দীর্ঘ দিন ধরেই এই কীটনাশককে নিরাপদ বলে আসছিল। সরকার সেই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেই আর্ন্তজাতিক পরিবেশ-সংক্রান্ত সভায় তীব্র ভাবে একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার বিরোধিতা করে এসেছে ১৯৮৪ সাল থেকেই। আর দেশে বেড়েছে অসুস্থ মানুষের সংখ্যা। ভারতের প্রধান তিনটি উৎপাদক সংস্থা হল--এক্সেল ক্রপ কেয়ার, হিন্দুস্থান ইনসেকটিসাইড ও করমন্ডল ফার্টিলাইজার। এদের মিলিত উৎপাদন দেশের জন্য ৪৫০০ টন ও রফতানির জন্য ৪০০০ টন।

২০০৬ সালে কেরালার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডি. এস. অচ্যুতানন্দ এন্ডোসালফানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য সচেষ্ট হন। সি.পি.এম-এর যুব সংগঠন ডি.ওয়াই.এফ.আই সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা করে। অচ্যুতানন্দের অনশন ও সেই সংক্রান্ত রাজনৈতিক তরজা সত্ত্বেও কেরালার প্রায় সব রাজনৈতিক দলই নিষিদ্ধ ঘোষণার পক্ষে ছিল। সলিডারিটি ইউথ মুভমেন্ট, জামাত-ই-ইসলামি (কেরালা)— সহ বহু স্বেচ্ছাসেবী, এমনকী, ধর্মীয় সংগঠন এর প্রতিবাদে রাস্তায় নামে। ভূপাল দুর্ঘটনার পরেই একে রাসায়নিক-ঘটিত সবচেয়ে বড় পরিবেশ দূষণ বলে বর্ণনা করা হয়।

কেরালার পাশাপাশি কর্নাটক এবং গুজরাত থেকেও প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর জোরালো হয়ে উঠতে থাকে। ২০১০ সালের ১০ নভেম্বর কেরালা এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ সালে কর্নাটক সরকার এর ব্যবহার সাময়িক ভাবে নিষিদ্ধ করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শরদ পাওয়ার জাতীয় স্তরে কোনও রকম নিষেধাজ্ঞা জারি করতে রাজি হননি। ২০১১ সালের ১৩ মে সুপ্রিম কোর্ট সাময়িক ভাবে এন্ডোসালফানের উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন, যা সারা দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, ১৯৮৪ সাল থেকেই বিভিন্ন দেশ এই কীটনাশক নিষিদ্ধ

ঘোষণা করেছিল। ২০০৭ সালের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ৫০টি দেশ একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে সম্মত হয়। ২০১০ সালে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ৮৪। স্টকহোম কনফারেন্স যখন শুরু হয়, তখন কেবলমাত্র চিন ও ভারত ছাড়া ১২৭টি দেশ এই কীটনাশককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ বছর ২৫ এপ্রিল জেনেভায় পঞ্চম পর্যায়ের বৈঠকে আন্তর্জাতিক চাপে ভারত বাধ্য হয়ে সম্মত হয়েছে এই কীটনাশকের ব্যবহার ধাপে ধাপে বন্ধ করে দিতে। কিন্তু তা করারও সময়সীমা ৫-১১ বছর। কারণ এর বিকল্প যে সব কীটনাশক, তাদের দাম ১০ থেকে ৪০ গুণ বেশি। 'উন্নয়নশীল' দেশের অর্থনীতিতে যাতে প্রভাব না-পড়ে, যাতে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের লেখচিত্র উর্ধ্বগামীই থাকে, তাই আরও এক দশক ধরে হাজার হাজার মানুষের অসুস্থতা ও পঙ্গুত্বকে মেনে নিতে হবে বৈকি!

এন্ডোসালফানের উদ্ভাবক বেয়ার ক্রপ সায়েন্স হল নাৎসি জার্মানিতে হিটলারের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও যুদ্ধের তহবিল সরবরাহকারী আই জি ফ্যারবেন নামক রাসায়নিক ও ঔষধ কোম্পানির প্রত্যক্ষ উত্তরসূরি। এই সংস্থা ৬ কোটি ইহুদি-হত্যায় গ্যাস চেম্বারে বিষবাষ্পের প্রধান সরবরাহ-কারী এবং আউশভিৎশ বন্দি শিবিরের প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এরা বিপুল সম্পদের মালিক হয়। ১৯৪৫-এর পর 'যুদ্ধ-অপরাধ' এড়াতে আই জি ফ্যারবেন ভেঙে হয় হেক্স্ট, বেয়ার ও বি.এ.এস.এফ নামে তিনটি কোম্পানি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে Telferd Tayler এর 'The Sword and Swastika' বইটি পড়ুন। জনশ্রুতি, বিপুল পরিমাণ উৎকোচের বিনিময়ে এই সংস্থার ২৪ জন কর্মকর্তা যুদ্ধ-অপরাধের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পান। সেই ঘাতক কোম্পানি স্বাগত জানিয়েছে এন্ডোসালফান নিষিদ্ধ করাকে। অবিশ্বাস্য? মোটেই নয়। এন্ডোসাল-ফানের পেটেন্ট অনেক আগেই চলে গিয়েছে বেয়ার-এর হাত থেকে। এখন এই পেটেন্ট-বহির্ভূত কীটনাশক অনেক কম দামে তৈরি হয়। বেয়ারের আনন্দ এখানেই যে, ওই কীটনাশক নিষিদ্ধ হলে, তার বদলে পেটেন্টজাত নতুন কীটনাশক বাজারে আনবে তারা। ২৭০-৩০০ টাকা লিটারের এন্ডোসাল-ফানের জায়গায় ৩০০০ থেকে ৭০০০ টাকা লিটারের মহার্ঘ্য বিষ। প্রথমে প্রচার হবে তা সম্পূর্ণ নিরাপদ। দু'-দশ বছর বাদে স্বরূপ প্রকাশিত হবে। তাই বেয়ারের এত উল্লাস। এত স্বাগত জানানো।

এই ভাবেই কি চলবে ভারতীয় কৃষকের জীবন? আমার আপনার জীবন? প্রাণঘাতী কীটনাশক, রক্তপিপাসু বহুজাতিক আর সহানুভূতিহীন বিদেশি পুঁজির পদলেহী সরকারের অলাতচক্রে? কে জানে এর উত্তর?

বুকের ব্যথার ব্রহ্মজ্ঞান

ডা. পার্থপ্রতিম পাল, এম. বি. বি. এস.

বুকের ব্যথা কখনও কখনও মারাত্মক। যেমন হার্ট অ্যাটাক। তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু না-করলে কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হতে পারে। আবার বুকের পেশি বা হাড়ের প্রদাহে অসহ্য বুকে ব্যথা হতে পারে, যা থেকে বড় ক্ষতি হয় না।

কোন্ বুকে ব্যথা কখন প্রাণঘাতী, সেটা সাধারণের বোধগম্য করে আলোচনা মুশকিলের। অবশ্যই এ কারণে বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়া চলে না। হার্ট অ্যাটাকের জন্য হঠাৎ মৃত্যু আমাদের নিত্যকার অভিজ্ঞতা। একটু সচেতন হলে, তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে, এ ধরনের মৃত্যু রুখে দেওয়া সম্ভব।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার , কিছু কিছু ব্যথা রয়েছে, যেগুলোর চিকিৎসা বাড়িতে করা যায় না, শুধুমাত্র হাসপাতাল বা বড় নার্সিংহোমে করা যায়। এ সব ক্ষেত্রে দু'-মিনিটের মধ্যে কোনও ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে নিতে পারলে ভালো, না-হলে সোজা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

রোগের নাম হার্ট অ্যাটাক:

হৃদযন্ত্রের কোনও অংশে রক্ত চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে হার্ট অ্যাটাক হয়। হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। যদি দু'-চার ঘণ্টার মধ্যে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়, তবে মৃত্যুর সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

হার্ট অ্যাটাক কী ভাবে চেনা যায় ?

বুকের মাঝখানে বা বাঁ দিকে ব্যথা হয়। ব্যথা ছড়িয়ে যেতে পারে বাঁ কাঁধ বা বাঁ হাতের দিকে। ডান দিকের হাতেও ব্যথা ছড়িয়ে যেতে পারে। এ ছাড়াও, উপরে চিবুকের

দিকে বা নীচে পেটের দিকেও ব্যথা ছড়িয়ে যেতে পারে। ব্যথার সঙ্গে সাধারণত প্রচুর ঘাম হয়। বুকে চাপ ধরে। শ্বাসকষ্ট হতে পারে। বমিভাব বা বমি হতে পারে। রোগীকে বিবর্ণ বা ফ্যাকাসে লাগে। ঠোঁট নীল হয়ে যায়, খুব মুমূর্ষু বা অসুস্থ মনে হয়। ব্যথার চোটে রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন। কথা বলার শক্তি প্রায় থাকেই না।

হার্ট অ্যাটাক মনে হলে কী করবেন ?

সময় নষ্ট না-করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। মুখে জিভের তলায় একটা Aspirin 300 mg ট্যাবলেট আর Sorbitrate 5 mg . ট্যাবলেট দিয়ে দিতে হবে। ওষুধ লালার সঙ্গে মিশে কাজ করবে। চটজলদি অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে পারলে খুব ভালো হয়। তবে কিছুর জন্যই হাসপাতালে যেতে খুব দেরি করলে চলবে না। মনে রাখবেন, হার্ট অ্যাটাক না-হলেও একটা Aspirin আর একটা Sorbitrate ট্যাবলেট কারও বড় কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

খুব খারাপ অবস্থায় আর কী করা সম্ভব ?

রোগীর শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে বা নাড়ি পাওয়া না-গেলে, যারা ফার্স্ট এইড জানে, তারা কৃত্রিম ভাবে শ্বাস চালু রাখার চেষ্টা করতে পারে। কিছু না-করার চেয়ে কিছু করা ভালো, এ যুক্তিতে ফার্স্ট এইড না-জানা ব্যক্তি রোগীর বুকের মাঝখানে (দুই স্তনের মধ্যবর্তী স্থানে বা মাঝখানে) একটা হাতের উপরে একটা হাত রেখে মিনিটে সর্বাধিক একশো বার চাপ দিয়ে কার্ডিয়াক ম্যাসাজ করার চেষ্টা করতে পারেন। যত ক্ষণ পর্যন্ত না কোনও ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে, এটা চালিয়ে যেতে হবে।

হার্ট অ্যাটাক কাদের বেশি হয় ?

মাঝবয়েসি এবং যুবকদের বেশি হয়। মেয়েদের রজঃনিবৃত্তির পরে হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। যারা সিগারেট খান, উচ্চ রক্তচাপ আছে, রক্তে চিনির পরিমাণ বেশি (ডায়াবেটিস), রক্তে ফ্যাট বা তেলের পরিমাণ বেশি (হাইপার কোলেস্টেরলামিয়া) এবং যাদের পরিবারে হার্ট অ্যাটাকের ইতিহাস রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাক বেশি হয়।

হঠাৎ বুকে ব্যথা এবং সে জন্য মৃত্যু আর কোন্ কোন্ রোগে হতে পারে ?

পালমোনারি এমবোলিজম : দীর্ঘ দিন শয্যাশায়ী থাকলে, বহু ঘণ্টা ট্রেনে বা প্লেনে চড়লে, অপারেশনের পরে বুকে অসহ্য ব্যথা শুরু হলে সেটা এ রোগ সন্দেহ করা হয়। হার্ট

অ্যাটাকের ব্যথার মতই ব্যথা হবে, সঙ্গে মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে পারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু করতে হবে, রক্ত তঞ্চন-বিরোধী ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এ রোগেও মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি।

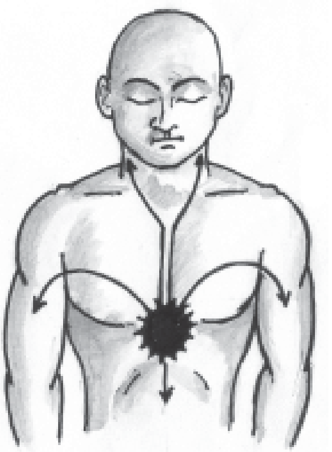

হার্ট অ্যাটাকের ব্যাথা যেভাবে ছড়ায়

অ্যাওর্টিক ডিসেকশন : বুকের বড় রক্তনালি (অ্যাওর্টা) ফেটে যায়। ব্যথার লক্ষণ আগের মতোই। একমাত্র হাসপাতালে অপারেশন করে চিকিৎসা করা যেতে পারে। এ রোগ হলে রোগীকে বাঁচানো মুশকিল।

রিব ফ্র্যাকচার : আঘাত পেয়ে পাঁজর ভেঙে যায়। দুর্ঘটনায় বা লাঠি/ ছুরির আঘাতে হতে পারে। মুশকিল হয় ভাঙাপাঁজর হৃদযন্ত্রে বা ফুসফুসে ঢুকে গেলে। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসা শুধু হাসপাতালেই করা সম্ভব।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বুকে ব্যথা অ্যাঞ্জাইনা : অ্যাঞ্জাইনা হচ্ছে হার্ট অ্যাটাকের ছোট ভাই। এ রোগে হৃদযন্ত্রের কোনও অংশে রক্ত চলাচল সাময়িক বন্ধ হয়ে যায় বা কমে যায়। হার্ট অ্যাটাকের মতোই ব্যথার বিচরণক্ষেত্র। অসহ্য ব্যথা দু'-তিন মিনিট স্থায়ী হয়। প্রচুর ঘাম হতে পারে। মাঝবয়েসি এবং বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়। ব্যথা হঠাৎ শুরু হতে পারে বা কখনও-কখনও প্রবল উত্তেজনায়, প্রচুর পরিশ্রমে, গুরুভোজে অথবা বেশি ঠান্ডা পড়লে এ ধরনের ব্যথা শুরু হয়। অসহ্য ব্যথা দু'-তিন মিনিট স্থায়ী হয়। তার পর রোগী অনেক সুস্থ বোধ করেন। আবার কিছু ক্ষণ পরে ব্যথা শুরু হতে পারে।

অ্যাঞ্জাইনা মনে হলে কী করতে হবে?

রোগীর বুকে ব্যথা হল, দু'-তিন মিনিট বাদে কমে গেল, রোগীকে অতটা অসুস্থ দেখাচ্ছে না, এ রকম হলে, রোগীকে যত দূর সম্ভব বিশ্রামে রেখে, জামাকাপড় আলগা করে দিয়ে জিভের নিচে একটা Sorbitrate 5mg ট্যাবলেট আর মুখে একটা Aspirin 300mg ট্যাবলেট দিয়ে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে হবে। রোগীর অন্তত একটা E.C.G. করা দরকার। ডাক্তারবাবু পরামর্শ দিলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

অ্যাঞ্জাইনার ব্যাথা যেভাবে ছড়ায়

আর যে সমস্ত কারণে বুকে ব্যথা হতে পারে

নীচে যে সমস্ত রোগের আলোচনা করা হচ্ছে, সেগুলো হঠাৎ মৃত্যুর কারণ হয় না। ব্যথা দু'-চারদিন ধরে চলে। ঠিক মতো চিকিৎসা না-হলে বিপদ আসতে পারে।

বুকের রোগ

নিউমোনিয়া বা প্লুরিসি - জ্বর, সর্দি, কাশি থেকে শুরু হয়। আর সর্দি-কাশি থেকে বা আঘাত লেগে ফুসফুসের পর্দার মধ্যে হাওয়া ঢুকেও অসহ্য ব্যথা শুরু হতে পারে নিউমোথোরাক্স রোগে। এ রোগগুলিতে যে কোনও দিকে অথবা পুরো বুক জুড়ে ব্যথা হতে পারে। এক্সরে ও রক্ত পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাড়িতেই চিকিৎসা করা হয়।

উপর পেটের রোগ

পিত্তপাথুরি বা বিলিয়ারি কোলিকের ব্যথা এমন ভাবে বুক, পিঠ বা কাঁধে ছড়িয়ে পড়তে পারে, যাকে বুকের ব্যথা বলে ভুল হয়। তবে উপরের পেট পরীক্ষা করলে ব্যথার মূল জায়গাটা বোঝা যায়। আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে রোগ নির্ণয় করা হয়। চিকিৎসা অপারেশন।

হৃদ্‌যন্ত্রের আচ্ছাদনের প্রদাহ হলে - সেটার নাম পেরিকার্ডাইটিস। বুকের মাঝখানে বা বাঁ দিকে ব্যথা হয়ে থাকে, শুয়ে পড়লে ব্যথা বাড়ে এবং সামনের দিকে ঝুঁকে থাকলে ব্যথা কম মনে হয়। বুকের এক্স-রে , ইসিজি করে রোগ নির্ণয় করা যায়। চিকিৎসা, ব্যথার ওষুধ।

সিংগ্‌ল্‌স্ বা হার্পিস

বুকের যে কোনও দিকে ব্যথা হতে পারে। তবে ব্যথার সঙ্গে সঙ্গেই, বা ব্যথা শুরু হওয়ার দু'-এক দিনের মধ্যে ব্যথার জায়গায় চাবড়া হয়ে ফুসকুড়ি বের হয়। চিকিৎসা, ব্যথার ওষুধ।

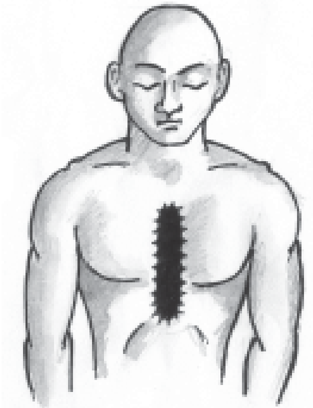

হার্টবার্নের ব্যাথা

হার্টবার্ন

বুকের মাঝখানে ব্যথা করে, জ্বালা হয়। যাঁরা অম্বলের রোগী, প্রায়ই মুখ টক হয়ে থাকে,

যাঁদের বদহজমের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের পাকস্থলী থেকে অ্যাসিড বা খাবার খাদ্যনালীতে উঠে এলে এ রোগ হয়। ইসিজি ও এন্ডোস্কোপি করে রোগ নির্ণয় করা হয়। চিকিৎসা, অম্বলের ওষুধ।

কস্টোকন্ড্রাইটিস : পাঁজরগুলি যেখানে বুকের সামনের হাড়ের সঙ্গে মেশে সেখানে জীবাণু সংক্রমণ হলে বা আঘাত লাগলে বুকের সামনের দিকে ব্যথা হয়। বাইরে থেকে চাপ দিলে রোগগ্রস্ত সন্ধিতে ব্যথা অনুভূত হয়। অ্যাঞ্জাইনায় বাইরে থেকে চাপ দিয়ে কোনও জায়গায় ব্যথা বাড়ে না। বরফ দিলে বা ব্যথার ওষুধ খেলে **কস্টোকন্ড্রাইটিস**-এর ব্যথা কমে।

বুকের পেশিতে টান ধরলে বুকের সামনের দিকে ব্যথা হতে পারে। একে ফিক ব্যথাও বলে। রিউম্যাটিক বাত রোগেও এ রকম ব্যথা হতে পারে। চিকিৎসা, ব্যথার ওষুধ।

মানসিক দুশ্চিন্তা বা **অবসাদের** প্রকাশ হিসাবে অনেক সময় বুকে ব্যথা হয়। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও কিছু পাওয়া যায় না। মনের ডাক্তারবাবুর চিকিৎসায় এ রোগ সারে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, বুকে ব্যথা হলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ঠিক সময়ে ঠিক কাজটা করতে পারলে বেশির ভাগ রোগীকেই বাঁচানো সম্ভব। এখানেই অবশ্য এ আলোচনা শেষ করা যাবে না। বাকি রইল--

পাড়ার ডাক্তারবাবু ও বুকে ব্যথা

মাঝরাত্তিরে বা বর্ষার বুকজলা রাস্তায় যখন বড় ডাক্তারবাবুর বাড়ি নিঝুম, ডাকলে অ্যালসেশিয়ানের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ ছাড়া কোনও উত্তর মেলে না, রোগীর পরিজনরা তখন বা কখনও কখনও লোকাল ডাক্তারবাবুকে কৃপা করেন। অপদেবতা মাথায় চাপলে তার জন্য ঝাড়ফুঁক আছে। পাবলিক নামক অতিদেবতা কুপিত হলে থানা পুলিশ বা নেতারা কিস্যু করতে পারবেন না। রোগীর হার্ট অ্যাটাক হোক বা না-হোক, বেচাল মনে হলেই ডাক্তারবাবুর উপর অ্যাটাক গ্যারান্টিড। এ অবস্থায় কোন্ আহাম্মক দায়িত্ব নেবে? সিরিয়াস মুখ করে 'রেফার টু হসপিটাল' লিখে দিলেই দায় ঝেড়ে ফেলা যায়। যে রোগীর হয়তো একটা ব্যথার ট্যাবলেট পাওনা ছিল, পাকে-চক্রে তার বরাতে শিরা ফুঁড়ে নল দিয়ে জল, ইঞ্জেকশন জুটে যাবে। সে নার্সিংহোমের খাদ্য হবে, মোটা বিল মেটাবে। এতে কারও দোষ নেই। এ বিশ্ব সংসার মায়াময়। এই ডাক্তার-রোগী -ওষুধ-হাসপাতাল-কাটমানি-কমিশন --সব মায়া, অলিক। শুধু ব্রহ্ম সত্য, বাকি জগৎ মিথ্যা। ডাক্তারদের মধ্যে শ্রেণিবৈষম্য দূর করা, তথাকথিত লোকাল ডাক্তারদের সামাজিক সম্মান ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং চিকিৎসাকে পণ্য হিসাবে না-দেখা -- এ সব বলা বাতুলতা।

With Best Compliments from:

A. N. PharmaCia Laboratories Pvt. Ltd.

"adds new VISTA TO LIFE through excellent

coordination of body and mind"

26 years and beyond...

‘হার্ট অ্যাটাক’ হয়ে হাসপাতালে গেলে পরে ...

ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী, এম. বি. বি. এস., ডি. এন. বি., এম. সি. এইচ.

চিকিৎসা পরিভাষায় হার্ট অ্যাটাকের অর্থ Acute Myocardial Infarction বা হৃদ্‌কলাবিনষ্টি। আমরা একে হার্ট অ্যাটাক বলেই অভিহিত করছি। হার্ট অ্যাটাক হয়েছে জানলে সঙ্গে সঙ্গেই রোগীর পরিবার-পরিজন-বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে একটা বিরাট উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। দুশ্চিন্তা শুরু হয় জীবনের আশঙ্কা, ভবিষ্যতে নিরাপত্তা, আর্থিক চাপ ইত্যাদি নিয়ে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় হাসপাতাল, ডাক্তার, চিকিৎসাব্যবস্থা সব কিছু ঘিরে অবিশ্বাস। অমুক হাসপাতাল চোর, অমুক হাসপাতাল ভালো, ওই ডাক্তার ডাকাত তো সেই ডাক্তার এক নম্বর! শুভানুধ্যায়ীদের এমন অজস্র মতামতে জেরবার হন রোগীর নিকটজনেরা। হার্ট অ্যাটাকের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ও তার ফলাফল সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা থাকলে রোগীর বাড়ির লোকেদের অনেকটা সুবিধা হয়। অপ্রয়োজনীয় উদ্বেগ খানিকটা কমে।

হার্ট অ্যাটাক সন্দেহ হলে প্রথমে যা করতে হবে

প্রথমত, প্রতিটি অঞ্চল, থানা এবং জেলায় হার্ট অ্যাটাকের রোগীদের কোন্ কোন্ সরকারি হাসপাতাল এবং বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রে সুষ্ঠু চিকিৎসাব্যবস্থা রয়েছে, তা সেই অঞ্চলে কর্মরত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, স্বেচ্ছাসেবী, প্রশাসনের লোকজন এবং যে সমস্ত পরিবারে এ ধরনের রোগী আগে থেকেই রয়েছেন, তাদের জেনে রাখা জরুরি। এ ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য দফতরের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এ রকম রোগ সন্দেহ করলে, সময় নষ্ট না-করে রোগীকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। হার্ট অ্যাটাক আদৌ হয়েছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। হার্ট অ্যাটাক-জনিত মৃত্যু ও জটিলতা অনেকটাই কমানো যায়, যদি রোগী ও তার পরিজনেরা, স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকরা রোগের লক্ষণ বুঝে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে যান। এ ক্ষেত্রে অ্যাম্বুল্যান্স, বিশেষতঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী-সহ অ্যাম্বুল্যান্সে রোগীকে বহন করা দরকার।

আধুনিক জরুরি চিকিৎসা ও হৃদ্‌রোগ মোকাবিলায় সমস্ত প্রাথমিক নিরাপত্তাকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, স্বেচ্ছাসেবী ও চিকিৎসকদের হৃদ্‌শ্বাস পুনরুজ্জীবন (CPR) এবং ডিফিব্রিলেটরের ব্যবহার জানা আবশ্যক। দেখা গিয়েছে, এ রকম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা বহু হার্ট অ্যাটাকের রোগীকে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছেন।

হাসপাতালে পৌঁছনোর আগে যা করতে হবে

হার্ট অ্যাটাক সন্দেহ হলে হাসপাতালে নেওয়ার সময়ে রোগীকে অ্যাসপিরিন বড়ি (325 mg) ১টি অথবা ১/২ চিবিয়ে খেয়ে নিতে দেওয়া দরকার। এ ব্যাপারে আস্তরণহীন অ্যাসপিরিন বড়ি তাড়াতাড়ি কাজ করে। তবে কারও অ্যাসপিরিনে অ্যালার্জি থাকলে, তাকে তা দেওয়া যাবে না।

হৃদ্‌যন্ত্রে রক্ত চলাচলের অভাবজনিত উপসর্গ থাকলে, যদি সিস্টোলিক রক্তচাপ ৯০ মি.মি.-র নীচে না-হয়, তবে জিভের তলায় নাইট্রোগ্লিসারিন বড়ি প্রতি ৫ মিনিট অন্তর তিন বার দিয়ে যেতে হবে। সময় নষ্ট না করে অ্যাম্বুল্যান্সের মধ্যে ই.সি.জি.-র ব্যবস্থা থাকলে (যা অবশ্যই থাকা উচিত), স্বাস্থ্যকর্মী বা জরুরি পরিষেবা কর্মীরা তা করবেন। বহু দেশে এবং বহু ‘ক্রিটিক্যাল কেয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে’ ওই ECG-র পরিবর্তন অনুসারে পরবর্তী চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হাসপাতালে রোগী পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত চিকিৎসা শুরু করা যায়।

হার্ট অ্যাটাক হওয়ার ২ ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালে পৌঁছনো খুব দরকার, যাতে হৃৎপিণ্ডের পেশিতে রক্তচলাচল বন্ধ থাকার সময়কাল ২ ঘণ্টার মধ্যে রাখার লক্ষ্য পালন করা যায়। দেখা গিয়েছে, হার্ট অ্যাটাকে রোগীর মৃত্যু সব থেকে বেশি এই সময়ে ঘটে।

ECG-তে হার্ট অ্যাটাকের নির্দিষ্ট লক্ষণ পাওয়া গেলে তার ভিত্তিতেই পরবর্তী চিকিৎসা শুরু করা যায়। হার্ট উৎসেচক (Cardiac Enzymes) বা অন্য জৈব চিহ্ন (Biomarks) মাপার জন্য সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে ECG -তে নির্দিষ্ট পরিবর্তন দেখা যায় না, অথচ ক্লিনিক্যালি হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে হয়। তখন তঞ্চননাশক (Fibrinolysis) চিকিৎসার জন্য ওই পরীক্ষার (অর্থাৎ হার্ট উৎসেচক ও জৈব চিহ্ন দেখা) বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

হাসপাতালে ১২০ মিনিটের মধ্যে পৌঁছলে তিন রকমের সম্ভাবনা থাকে -

(১) হাসপাতালে পৌঁছনোর আগেই সেরকম ব্যবস্থা থাকলে, বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগীর কাছে পৌঁছনোর ৩০

মিনিটের মধ্যে তঞ্চননাশক ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা শুরু করে দিলেন।

(২) সেরকম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী না-থাকলে এবং হাসপাতালটিতে পারকিউটেনিয়াস করোনারি ইন্টারভেনশন (PCI), যথা অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করার ব্যবস্থা না-থাকলে হাসপাতালে ভর্তি থেকে তঞ্চননাশক ওষুধ ৩০ মিনিটের মধ্যে চালু করা উচিত। এই ৩০ মিনিটকে বলা হয় Door to Needle Time।

(৩) যদি প্রাথমিক অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করার ব্যবস্থা থাকে, তা হলে তা দেড় ঘণ্টার মধ্যে করতে হবে।

এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে রোগীকে পারকিউটেনিয়াস করোনারি ইন্টারভেনশন (PCI) -এর জন্য এই সময়ের মধ্যে স্থানান্তরিত করা যায়, যদি রোগীর তঞ্চননাশক ব্যবহার করার নিষেধ বা আপত্তি থাকে বা তঞ্চননাশক ব্যর্থ হয়।

PCI-Stenting এবং ওষুধ দিয়ে তঞ্চননাশ করে হৃদ্‌পেশিতে রক্ত চলাচল শুরু করতে পারলে, হার্ট অ্যাটাকের জটিলতা এবং মৃত্যুর হার কমানো যায়। তবে এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কখন তঞ্চননাশক ওষুধ ব্যবহার হবে, কখন হবে না, কোন্ ওষুধ কীভাবে ব্যবহার হবে, প্রাথমিক অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করার শর্ত কী কী, তা নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের শর্ত, ওই হাসপাতালে বা নিকটবর্তী অঞ্চলে হৃদ্‌রোগ চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা কেমন আছে — এ সব বিষয় মাথায় রেখে বিশেষজ্ঞ কমিটির নির্দিষ্ট সুপারিশ নির্ধারিত হয়। এই সুপারিশ যা চিকিৎসক ও হাসপাতালের মেনে চলার কথা, যদিও বহু ক্ষেত্রে তা মানা হয় না। এটা কিন্তু অন্যায়, চিকিৎসায় গাফিলতি।

PCI ওষুধ দিয়ে তঞ্চননাশ ছাড়াও বহু ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাকের ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের দেওয়ালে ফুটো(VSD)হয়, ভাল্‌ভ্ ঠিক মতো কাজ করে না (MR)। তখন এ রকম কিছু জটিলতা সারাতে শল্য চিকিৎসারও প্রয়োজন হয়। কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জরুরি করোনারি বাইপাস সার্জারি করতে হয়।

তঞ্চননাশক এবং বিটা ব্লকার-এর মতো ওষুধ ব্যবহারে হার্ট অ্যাটাক-জনিত মৃত্যু যে অনেকটা কমিয়ে আনা গিয়েছে, সেটা গবেষণায় প্রমাণিত। ICU-তে হার্ট অ্যাটাকের রোগীকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এগুলো ছাড়াও অক্সিজেন এবং বেশ কিছু দামি ওষুধের প্রয়োজন হয়। কখনও কখনও জটিল ক্ষেত্রে ভেন্টিলেটর, IABP, অস্থায়ী পেসমেকার ইত্যাদি খরচসাপেক্ষ জীবনদায়ী মেশিনেরও প্রয়োজন হয়।

হার্ট অ্যাটাকের যে সব রোগী ১২-২৪ ঘণ্টা স্থিতাবস্থায় থাকেন, তাঁদের Step Down বিভাগে স্থানান্তরিত করা যায়। অপ্রয়োজনীয় ভাবে ICU-তে রেখে খরচ বাড়িয়ে রোগীর কোনও লাভ হয় না। তবে সেখানে রোগীর ECG , অক্‌সিজেন সম্পৃক্ততা মাপা (O_2 Saturation) এবং দক্ষ নার্সের উপস্থিতি আবশ্যক।

Step down-এর পরে ও ছুটির আগে রোগীকে হাঁটানো হয় এবং রোগীর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। রোগীর দুশ্চিন্তা লাঘব, খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাত্রা-- এ সবের পরিবর্তনের ব্যাপারে আলোচনা করতে হয়। রোগীর পরিবারের লোকেদেরও এই প্রশিক্ষণে সামিল করা দরকার। ছুটির সময় রোগী ও তাঁর পরিজনকে পরবর্তী চিকিৎসা-পরিকল্পনা জানানো আবশ্যক।

হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসা নিয়ে প্রাথমিক কিছু আলোচনা করা হল। এগুলো মাথায় থাকলে রোগের মুখোমুখি হলে আমরা হয়তো দিশেহারা হব না।

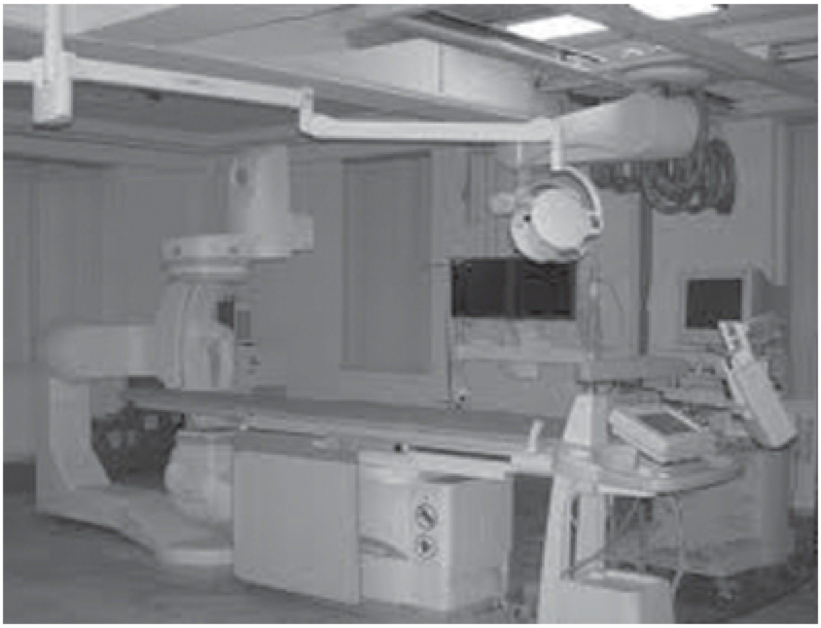

কার্ডিয়াক ক্যাথ ল্যাব

অচেনা অন্ধকারে

ডা. আশীষকুমার কুন্ডু, এম. বি. বি. এস., ডি. সি. এইচ., এম. ডি

রোগী দেখার ফাঁকে চোখে পড়ল ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এক রূপসী মহিলা। বেশ বড়সড় এক ছেলে কোলে। সোজা তাকিয়ে আমার দিকে — আমার কাজকর্ম লক্ষ করছে মনে হয়।

তার পালা আসতে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। চোখে পড়ার মতোই। গ্রাম-বাংলার সেই প্রতীকী বধূ, ডাগর চোখ। তেল চিক চিক চুলের জোয়ার, পাট ভাঙা শাড়িতে টান টান শরীর। সেই যে, 'কোনও এক গাঁয়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই শোনো।' একরাশ উজ্জ্বল হাসি নিয়ে মেয়েটি বলল-- 'ডাক্তারবাবু, আমার ছেলে.......।'

যদিও হাসার কিছু ছিল না। মিষ্টি দেখতে বছর ছয়েকের ছেলেটির দু'-পা-ই পঙ্গু। সারা গায়ে পেচ্ছাপের গন্ধ। এক বছর আগে মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে যায়। রোগীর ভিড়ে বেশি কথা বলার সময় নেই, ভর্তি করে নিলাম।

* * *

ছেলেটির নাম শরৎ। শরৎ কেন কে জানে? শরৎকালে জন্মেছিল? নাকি রোদ ঝলমলে শরতের আকাশ বলে?

শরৎ আমার তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে ভর্তি রইল সাত-আট মাস। আমি নতুন চাকরিতে ঢুকেছি। একটা বড় হাসপাতালের সহ-অধিকর্তা। আমার কাছে শরৎ তখন একটা প্রতিজ্ঞা। আমি রিহ্যাবিলিটেশন স্পেশালিস্ট। শরৎকে রিহ্যাবিলিটেড করতে হবে। তার পুনর্বাসনই তার চিকিৎসা।

শরতের বাড়ি ছিল পশ্চিমবঙ্গের কোনো এক গ্রামে। কোন্ গ্রাম তাতে এখন আর কিছু যায় আসে না। সামান্য জমি। বাবা দিনমজুর। বাড়িতে লাউ, উচ্ছে, কুমড়ো। নিকোনো উঠোন। সন্ধের প্রদীপ। চোখে স্বপ্ন-— আরও কিছু জমি। ধান চাষ। শরৎ খেলে বেড়ায়। ছ'বছর পূর্ণ হলে স্কুলে ভর্তি হবে।

বড় দাদাদের দেখে জাম গাছে চড়তে গিয়েছিল। বেশি নয়, হাত চারেক উঠেই পড়ে গেল। প্রথমে সবাই ভেবেছিল, এই টুকু পড়ে কিছু হয়নি। কিন্তু পা-দু'টো অসাড় হয়ে গেল। পেচ্ছাপ-পায়খানার হুঁশ থাকল না। কবিরাজ, মালিশ, তেল সরকারি হাসপাতাল, ধার-দেনা — সেই এক গপ্পো।

তরুণ বাবা-মা। চোখে স্বপ্ন, মনে তেজ। অতঃপর বাড়ি ঘর বেচে কলকাতায়। এসে গেল, 'ডাকিনী-যোগিনী'। বাবা এখন রিকশা চালায়। এদিক ওদিক ঘুরে শেষে আমাদের হাসপাতালে— পুনর্বাসনের আশায়।

শরৎ ভর্তি হল। শরৎ আমার চ্যালেঞ্জ। ওর পুনর্বাসন আমার প্রতিষ্ঠা।

* * *

শরতের রোগটা একটু জটিল। মেরুদণ্ডের এক নম্বর লাম্বার ভার্টিব্রা ভাঙা। কোনও চিকিৎসাতেই দু'পায়ে বল আর ফিরবে না। সারাদিন ফোঁটা ফোঁটা পেচ্ছাপের ফলে এক বছর ধরে নিতম্বে ঘা।

পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলাম। প্রথমে ঘা সারানো। ক্যাথেটার পরানো হল যাতে ক্ষতস্থান পেচ্ছাপে না-ভিজে যায়। মাসখানেক ক্যাথেটার পরে থাকল শরৎ।

কিন্তু ক্যাথেটার তো বেশি দিন পরিয়ে রাখা যায় না। তাতে মূত্রাশয়ে বার বার সংক্রমণ হতে থাকে। মেরুদণ্ডে চোটের পর যে পক্ষাঘাত হয়, তার প্রথম জটিলতা পেচ্ছাপের সংক্রমণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে সমস্ত সৈনিক মেরুদণ্ডে চোট পেয়ে ঘরে ফিরেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই এক-দেড় বছরের মধ্যে মারা যান পেচ্ছাপ এবং মূত্রাশয়ের সংক্রমণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আবিষ্কৃত হয় এক নতুন পদ্ধতি, যাকে বলা হয় I.C.C. (Intermittent Clean Cathetarisation)। রোগী নিজেই পরিষ্কার হাতে দিনে পাঁচ-ছ'বার পেচ্ছাপের রাস্তায় নল (ক্যাথেটার) পরাবে। পেচ্ছাপ হয়ে গেলে নল বের করে সাবান দিয়ে ধুয়ে শুকোতে দেবে।

সারা পৃথিবী জুড়েই মেরুদণ্ডে চোট পাওয়া রোগীরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করে সুস্থ রয়েছেন।

কিন্তু ছ'বছরের শরৎ কি নিজে তা পারবে? চেষ্টা তো করতেই হবে। শরতের মাকে নিয়ে পড়লাম। তাকে I.C.C. বোঝালাম। আর বললাম, দিনে-রাতে শরতকে চার-পাঁচবার I.C.C. করিয়ে দিতে।

শুরু হল লড়াই। দেখা গেল, দু'বার I.C.C.-র মধ্যেও শরতের নিজে থেকে কিছুটা পেচ্ছাপ হয়ে প্যান্ট ভিজে যাচ্ছে। অতএব জল কম খাওয়ানো আর কিছু দামি ওষুধ রোজ, যা হাসপাতালে পাওয়া যায় না। শরতের মায়ের দাঁত চেপে উত্তর -- 'হ্যাঁ। আমরা ওষুধ কিনব। যে ভাবেই হোক।'

শরতের পেচ্ছাপের সমস্যা মিটল।

পরের অধ্যায় দাঁড় করানো, হাঁটানো। দু'পায়ের জন্য দু'টো ক্যালিপার তৈরি করা হল। ক্যালিপার হচ্ছে লোহার রড লাগানো জুতো -- হাঁটুর ওপর পর্যন্ত রডগুলো তোলা। পায়ের বিভিন্ন অংশে চামড়ার বেল্ট পায়ের সঙ্গে রডকে বেঁধে রাখে। কিছু দিনের মধ্যেই শরৎ ক্যালিপার পরে দু'হাতে দু'টো ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। কী আনন্দ তার। সারাদিন ধরে ঠকঠক করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। উজ্জ্বল মুখ তার। কত কথা --- এবার সে স্কুলে ভর্তি হবে।

* * *

সন্ধেবেলা সল্টলেকে আমার আবাস থেকে ধীরে-সুস্থে হেঁটে চলেছি ক্রেশ থেকে আমার ছেলেকে আনতে। ক্রেশের কাছে একটা মোড় ঘুরতেই দু'জন দৌড়ে এসে টিপ টিপ করে প্রণাম করল। তাকিয়ে দেখি শরতের বাবা-মা। এত দিন বাবাকে ভাল করে চোখেই পড়েনি। শরৎ জুড়ে তো শরতের মা। বাবার ছিপছিপে, শান্ত, বলিষ্ঠ চেহারা। শরতের মা বলল -- 'যাও, ডাক্তারবাবুকে রিকশায় পৌঁছে দিয়ে এসো।'

আপত্তি জানিয়ে আমার জিজ্ঞাসা— 'কোথায় থাকো তোমরা?' আঙুল তুলে দেখায়— ফাঁকা মাঠে কিছু ঝুপড়ি বাড়ি। তাকিয়ে দেখলাম। এই বিশাল প্রান্তরে ক'দিন পরে গড়ে উঠবে সিটি সেন্টার।

আমার চ্যালেঞ্জ একটা বড় ধাক্কা খেল। শরতের পুনর্বাসনের কী হবে? আজ-নয়-কাল তারা এখান থেকে উচ্ছেদ হবে। ভেসে বেড়াবে। কোনও এক বস্তিতে আশ্রয় পাবে। সেখানে কি শরতের I.C.C. করানো যাবে? পরিষ্কার হাত, পরিষ্কার ক্যাথেটার? ওষুধ জুটবে? স্কুলে পড়বে?

এই ধরনের ছিন্নমূল সংসারের সন্তানের কি পুনর্বাসন হয়? 'নেই'-দের পুনর্বাসন কি তা হলে শুধু হাসপাতালের চৌহদ্দির মধ্যে? হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে আবার যে-কে-সেই? আমার চ্যালেঞ্জ আমারই ধৃষ্টতা।

* * *

আরও এক মাস কেটে গিয়েছে। ভাঙা মন নিয়ে শরতের চিকিৎসা চালিয়ে গেলাম। শরতের ঝকমকে মুখ, আশাভরা চোখ— আমার হতাশা ওকে ছোঁয়নি। ও স্কুলে ভর্তি হওয়ার স্বপ্ন দেখে চলেছে।

এক দিন রাউন্ডে গিয়ে দেখি শরতের মা নেই। তার জায়গায় এক অশীতিপর বৃদ্ধা। শরতের ঠাকুমা। ভাবলাম এক দিন ছুটি নিয়েছে। কে I.C.C. করাবে? একটু বিরক্ত হলাম। তবে মেনেও নিলাম। দু'-এক দিন গেল। প্রতিদিনই দেখি সেই বৃদ্ধা। রাগ হয়ে গেল। বৃদ্ধা কানে শোনেন না। তাঁকে I.C.C. করানোর পদ্ধতি বোঝাতেই পারলাম না। শরৎকে জিজ্ঞাসা করলাম, — 'মা কোথায়?' শরৎ নিরুত্তর। ওকে বললাম, তার বাবা যেন পরের দিনই আমার সঙ্গে দেখা করে।

পরের দিন আমার চেম্বারে শরতের বাবা এল। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বসতে বললাম। কুণ্ঠিত ভাবে বসল। একচোট গালাগালি দিলাম। বললাম --'আমি এত চেষ্টা করছি। শরতের মা নেই কেন? তোমার মাকে দিয়ে কিছু হবে না।' খানিক ক্ষণ চুপ করে থেকে নিচু গলায় শরতের বাবা যা বলল, তার সারমর্ম হল— শরতের মা চলে গিয়েছে, অন্য পুরুষের সঙ্গে।

চমকে উঠলাম। আছে আর নেই -এর বিভাজনে থেমে নেই সামাজিক পরিবেশ, শহুরে বস্তিতে ঢুকে পড়েছে অসংস্কৃতির নোনাজল। পরিচিত মূল্যবোধ ভেঙে চুরমার। নতুন কিছু গড়ে উঠছে কি?

এই অন্ধকারে শরতের পুনর্বাসন?

* * *

শরৎ আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল। গল্পটা এখানেই শেষ হতে পারত, কিন্তু হল না। আমাদের দেশে চারিদিকে কত গল্প।

দশ বছর কেটে গিয়েছে। সরকারি হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি অনেকদিন। এক কম খরচের বেসরকারি হাসপাতালে রোগী দেখছি। হঠাৎ শরতের বাবা। আর হ্যাঁ, সঙ্গে শরতের মা-ও। ভেঙে যাওয়া সংসারে জোড়াতালি দিতে ফিরে এসেছে। শরতের বাবা এখন রিকশা ছেড়ে গাড়ি চালায়। পোশাক-আশাকে উন্নতি হয়েছে। স্কুলে পড়া শরতের হয়নি। ক্যালিপার ভেঙে গিয়েছে। সেই সরকারি হাসপাতালে ফিরে গিয়ে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি শরতের বাবা-মা। এত দিন পরে আমায় খুঁজে পেয়ে ওদের আশা।

আমি জানি না আমি কী করব। রাস্তার অচেনা গর্তগুলো আমি অনেকটা চিনেছি। বড় সাবধানে পা ফেলতে হবে।

নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ ও আমাদের দেশ

ড. শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে তা নাগরিকদের সুবিধার জন্য অর্থের বিনিময়ে বিতরণের মতো এক পুরোপুরি কল্যাণকর পদক্ষেপ ভারতে আদতে ''গোপন কার্যক্রম''-এর অন্তর্ভুক্ত। ভারতের নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ, বিতরিত বিদ্যুতের অর্থমূল্য ইত্যাদি বিষয়, যা যে কোনও নাগরিকের জানার অধিকার সংবিধান মতে স্বীকৃত, সেই অধিকার ১৯৬২-র অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাক্ট দ্বারা প্রত্যাহার করা হয়েছে। আমাদের আলোচনা ঠিক এখান থেকেই শুরু করব।

জাপানের ফুকুশিমায় নিউক্লিয়ার চুল্লির দুর্ঘটনার পর স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, ভারতে এমন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে কি না। যদি ঘটে, তা হলে ভারত সরকার দুর্ঘটনা সামাল দেওয়ার জন্য কতটা প্রস্তুত। সমস্যা হল, গোপনীয়তায় ভরপুর ভারতের এই নিউক্লিয়ার সাম্রাজ্যে ভারতের জনগণ এ বিষয়ে রাষ্ট্রের সহায়তা আদৌ পাবে কি না, তা নিয়ে এক বড় প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে।

আমরা অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাক্ট থেকে শুরু করি। এই আইনে দুটি সাংঘাতিক ধারা রয়েছে। ধারা ১৮ (তথ্য জানা ও প্রচারে নিষেধাজ্ঞা) এবং ধারা ২৪ (অপরাধ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা) বলছে যে, নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা ফৌজদারি অপরাধ, এ নিয়ে সাধারণ নাগরিক, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কোনও সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা, এমনকী, ভারতের লোকসভা-রাজ্যসভাতেও প্রশ্ন তুললে, তা ''দেশ-বিরোধী'' কাজ বলে বিবেচিত হয়!

নিউক্লিয়ার বিষয়ে যাবতীয় তথ্য, পর্যবেক্ষণ, সমীক্ষা এবং পরীক্ষা করতে পারবে কেবলমাত্র সরকার-নিযুক্ত কমিটি, যার সদস্য হতে পারেন কেবলমাত্র ভারতের পরমাণুমন্ত্রকের বিজ্ঞানী এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। এমনকী, নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রর বাইরে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ কেমন, তা পরিমাপ করার অধিকার পরমাণুমন্ত্রকের বাইরের কোনও বিজ্ঞানী বা সরকারি সংস্থার বিজ্ঞানীদের নেই। ভোপাল দুর্ঘটনার পর বড় মাপের পরিবেশ দূষণ-রোধ এবং সেই দূষণের দায়ভাগ নেওয়ার জন্য ভারত সরকার পরিবেশ আইন, ১৯৮৬ প্রণয়ন করে। এই আইন মতে, যে কোনও প্রকল্প, তা সরকারি হোক বা বেসরকারি, তার জন্য পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিচার করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা বাধ্যতামূলক। সেই প্রকল্পের ক্ষতি ও সুবিধার বিষয়ে স্থানীয় মানুষের মতামত একটি গণশুনানির মাধ্যমে সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু নিউক্লিয়ার

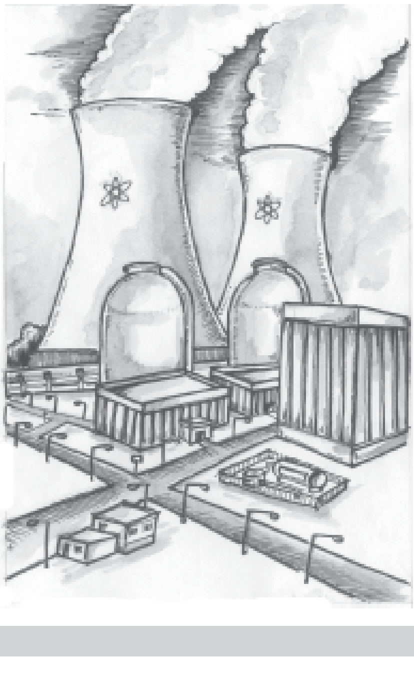

শক্তিকেন্দ্রের জন্য এই পরিবেশ আইন পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়। এক দিকে যেমন নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রগুলোর তেজস্ক্রিয়তা-জনিত দূষণ সাধারণ নাগরিকরা পরিমাপ করতে পারছে না, অন্য দিকে ভারতের মোটামুটি ভাবে কড়া পরিবেশ আইন নিউক্লিয়ারকেন্দ্রের জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে না। এর পাশাপাশি অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ড নামক যে সংস্থাটি নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনকেন্দ্রের দূষণ এবং তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপ করে ছাড়পত্র দেয়, সেই সংস্থাটি স্বশাসিত নয়, তা ভারতের পরমাণুমন্ত্রকের অধীনে। তাই এই সংস্থার দেওয়া তথ্য স্বভাবতই একপেশে ও পক্ষপাতিত্বে ভরপুর হয়।

ভারতে বিশ্বায়ন-পন্থী অর্থনীতি চালু হওয়ার পর একের পর এক আর্থিক কেলেঙ্কারি ঘটে চলেছে। সাম্প্রতিক টু-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি বা কমনওয়েলথ কেলেঙ্কারির কথা নিয়ে সারা দেশে তোলপাড় চলছে। সাংবাদিকরা প্রচুর ঝুঁকি নিয়ে সামরিক বাহিনীর নানা কেলেঙ্কারি পর্যন্ত ফাঁস করে দিয়েছেন। কিন্তু জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের পরমাণুমন্ত্রক সম্পর্কে কোনও আর্থিক কেলেঙ্কারির প্রমাণ পায়নি। কেন পায়নি তার খোঁজ করতে গেলেই আমরা জানতে পারব যে, এই সংস্থাটি সমস্ত নজরদারি সংস্থার উর্ধ্বে। এই সংস্থার আর্থিক আয়-ব্যয় ভারতের সংসদে পেশ করা হয় না, ভারত সরকারের মহা-হিসাব পরীক্ষক, কম্পট্রোলার জেনারেল পর্যন্ত এই হিসাব দেখতে চাইতে পারেন না। সবচেয়ে বড় কথা হল, এত খরচ করে, এত আয়োজন করে

যে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনের দেশপ্রেমিক দায়িত্ব পালন করল নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ-নিগম, সেই নিগম ভারতের কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঠিক তথ্য দিতে বাধ্য নয়।

এমনই এক গোপনীয়তায় ভরা, দুর্নীতির আখড়া যে পরমাণুমন্ত্রক, তার সঙ্গে এখন গাঁটছড়া বাঁধতে এগিয়ে এসেছে দেশি-বিদেশি নানা দুর্বৃত্ত সংস্থা। দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আমাদের শাসকবৃন্দ যে দুটি মারাত্মক বিশ্বাসঘাতী পদক্ষেপ নিয়েছেন, তার ফলে এই সমস্ত সংস্থাগুলি আহ্লাদে আটখানা হয়ে গিয়েছে। প্রথম যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা হল, মার্কিন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ''১২৩-নিউক্লিয়ার চুক্তি''। এই

চুক্তিই প্রথম বিদেশি এবং বেসরকারি সংস্থার নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে লগ্নির দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। এই চুক্তির পর পরই ক্রমান্বয়ে রাশিয়া, ফ্রান্স, স্পেন এবং এদের হাত ধরে বকলমে আরও অনেক দেশ ভারতে নিউক্লিয়ার চুল্লি বসাবে। ২০২৫ সালের মধ্যে ছ'টি করে ইউনিট সমন্বিত মোট ছ'টি গুচ্ছ-নিউক্লিয়ার চুল্লি বসবে সারা ভারতের উপকূলভাগ জুড়ে। এমন একটি গুচ্ছ-চুল্লি বসতে চলেছে মেদিনীপুরের হরিপুর অঞ্চলে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপটির পটভূমিটি একটু বলে নেওয়া যাক। ভোপাল দুর্ঘটনার পর রাজীব গান্ধি সরকার ইউনিয়ন কার্বাইড সংস্থার সঙ্গে যে ভয়াবহ সমঝোতা করে, তার ফলে ভোপালের গ্যাস-পীড়িত ব্যক্তিদের দুর্দশার অন্ত নেই। সারা দেশজুড়ে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, বিশেষত গ্যাস-পীড়িত ব্যক্তি এবং তাঁদের নানান সংগঠন দেশে-বিদেশে যে প্রচার চালাতে থাকে, তাতে ইউনিয়ন কার্বাইড বিপদে পড়ে। ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে কার্বাইড তাদের সম্পত্তির বেশির ভাগটাই বিক্রি করে চম্পট দেওয়ার পর ক্রেতা সংস্থা ডাও কেমিক্যালও সেই একই বিপদের সম্মুখীন হয়। নানা চাপে পড়ে ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত ডাও কেমিক্যালকে ভোপাল দুর্ঘটনার দায় স্বীকার করতে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে চাপ সৃষ্টি করে। এই কাণ্ড দেখে নিউক্লিয়ার চুল্লির কারবারিরা ভীত হয়ে পড়ে। তারা নিজেরা সম্যক ভাবেই জানে যে, তাদের চুল্লিগুলি দুর্ঘটনা-প্রবণ, এই সব চুল্লি যে কোনও দিন, চের্নোবিল, থ্রি-মাইলস আইল্যাণ্ড বা সাম্প্রতিককালের জাপানের ফুকুশিমার মতো বিস্ফোরিত হয়ে ভয়াবহ দূষণ ছড়াতে পারে। এমন অবস্থায় যদি ভারত সরকারের আইন অনুযায়ী দুর্ঘটনার দায় স্বীকার করে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তবে তাদের লাভের গুড় স্রেফ পিঁপড়েতে খেয়ে যাবে। রতন টাটা-সহ ভারতের বিদেশি সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা বড়ো বড়ো উদ্যোগপতিদের মাধ্যমে নিউক্লিয়ার চুল্লি ব্যবসায় যুক্ত বিদেশি সংস্থাগুলো ভারত সরকারের কাছে আইন শিথিল করার আবেদন জানায়।

বিদেশি লগ্নিকারীদের সবুজ-সংকেত দেওয়ার জন্য মনমোহন সিং যেমন ব্যক্তিগত ভাবে উদ্যোগ নিয়ে, সংসদে মতৈক্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত ''১২৩-চুক্তি''-র খসড়ায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করে বুশ সাহেবের ভারত সফরের আগে চুক্তিটিতে শিলমোহর বসান, ঠিক তেমনই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট সারকোজির ভারত সফরের প্রাক্কালে ''সিভিল নিউক্লিয়ার লায়াবিলিটি বিল''--এ গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করে (এবং অবশ্যই সংসদকে এড়িয়ে গিয়ে) ফরাসি সংস্থাগুলোকে ভারত সরকার সবুজ-সংকেত পাঠায়। এই বিলটির মর্মার্থ হল, বিদেশি চুল্লিতে যদি দুর্ঘটনা ঘটে, তবে তার জন্য বিদেশি সংস্থার দায়িত্ব হবে কম। ফলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণও হবে কম। তা ছাড়া, এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের পদ্ধতি এতই জটিল করেছে ভারত সরকার যে, অত্যন্ত দক্ষ মানুষ ছাড়া কেউই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করতে পারবে না। মনমোহন সিং এই গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনটি নিজে জুড়েছেন।

ভারত সরকার বিদেশি সংস্থার জন্য এমন ঢালাও সুবিধে দেওয়ার ফলে সারা পৃথিবীর সন্দেহজনক সমস্ত সংস্থা তাদের তামাদি হয়ে যাওয়া (কেননা গত ৩৫ বছরে একটিও নিউক্লিয়ার চুল্লি বিক্রির বরাত না-পাওয়ায় সংস্থাগুলো গবেষণা খাতে লগ্নি ক্রমাগত কমিয়ে দিয়েছে) অথবা অপ্রমাণিত প্রযুক্তি ভারতকে বিক্রি করতে উপস্থিত হয়েছে। তারা জানে যে, ভারতের পরমাণুমন্ত্রকের মতো একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন, দুর্নীতির আখড়া এবং গোপনীয়তায় ভরপুর (যা আমরা নিবন্ধের শুরুতেই বলেছি) সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া

বাঁধতে পারলে তাদের দুর্বৃত্তবৃত্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না!

কোদানকুলমের কাহিনী : ''ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী''-র প্রতীক হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ ও ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধির সঙ্গে একটি চুক্তির পর তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া ভারতকে কয়েকটি নিউক্লিয়ার চুল্লি নিয়ে বানানো ''গুচ্ছ-নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র'' তৈরির প্রযুক্তি, কাঁচামাল ও সমস্ত যন্ত্রাংশ সরবরাহ করবে বলে ঠিক হয়। সোভিয়েত রাশিয়া পৃথিবীর মানচিত্র থেকে অবলুপ্ত হওয়ার পরও কিন্তু নব্য রাশিয়া ভারতের সঙ্গে চুক্তিটি বহাল রাখে। রাজীব গান্ধির মৃত্যুর পর এই নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে পরবর্তী কয়েকজন মন্ত্রী নিশ্চুপ থাকার পর পোখরান-২ বিস্ফোরণের পর বাজপেয়ী সরকার এই চুক্তিটিকে ধুলো ঝেড়ে সামনে আনেন। মনমোহন সিং মার্কিন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ''১২৩ নিউক্লিয়ার চুক্তি'' সম্পাদন করার পর, ২০০৬ সালে তামিলনাড়ুর উপকূলে প্রস্তাবিত এই নিউক্লিয়ার চুল্লির নির্মাণের কাজ শুরু হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল, ১৯৮৮ সালে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর যে নির্মাণ ও প্রযুক্তিগত নকশা রাশিয়া পেশ করেছিল, ২০০৬ সালেও সেই একই নকশার ভিত্তিতে কাজ শুরু করল। দুঃখের বিষয়, রাশিয়া ভারতে যে প্রযুক্তির নিউক্লিয়ার চুল্লি সরবরাহ করেছে, সেটি চের্নোবিলে বিস্ফোরিত চুল্লির মাসতুতো ভাই বলা যায়। পরবর্তী সময়ে খোদ রাশিয়া ছাড়াও বিশ্বের অনেক বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ এই চের্নোবিল-ধরনের চুল্লির অসংখ্য খুঁত বের করেছেন। রাশিয়া যদিও তার নিজের দেশের জন্য এই সব খুঁতের অনেকগুলোই মেরামত করে নিয়েছে, কিন্তু তারা ভারতকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে, নকশায় পরিবর্তন অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ হওয়ায় তারা ভারতের জন্য সেই মেরামতি করবে না। চুক্তিমতে, ভারত সেই সময়কার নকশাকে মেনে নিতে বাধ্য। ২০০৪ সালে ইন্দোনেশিয়ায় ঘটা সুনামির রেশ তামিলনাড়ুর উপকূলে আছড়ে পড়ে কলাপক্কমের নিউক্লিয়ার চুল্লিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই নিয়ে সারা ভারতে হইচই পড়ে গেলে ভারতের পরমাণুমন্ত্রক রাশিয়ার কাছে চিঠি লিখে জানতে চায় যে, রাশিয়ার চুল্লিগুলি জাপানের সুনামি-নিরোধক ইমারতি প্রযুক্তি

মোতাবেক নির্মাণ করা যায় কি না, (যদিও সাম্প্রতিক ফুকুশিমা নিউক্লিয়ার চুল্লির দুর্ঘটনা জাপানি সুনামি-নিরোধক প্রযুক্তির ফানুস ফাটিয়ে দিয়েছে)। রাশিয়ার সংস্থা ''রুশ-অ্যাটম'', যারা কোদানকুলমের মূল নির্মাণ সংস্থা, স্পষ্ট ভাষায় লিখিত ভাবে জানিয়ে দিয়েছে, রাশিয়ান নকশাটি এমনই যে তাকে জাপানি ইমারতি নকশায় বসানো যাবে না। অর্থাৎ সুনামি-প্রবণ সমুদ্র উপকূলে যে নিউক্লিয়ার চুল্লিটি বসছে, তাতে সুনামির জন্য কোনও সুরক্ষা থাকছে না।

মঞ্জুরি পাওয়ার ১৮ বছর পর, ২০০৬-এ কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছে দীর্ঘ ২৩টি বছর। যে সমস্ত বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে এই চুল্লির নকশা বানানো হয়েছিল, আজকের দিনে তার কোনো অস্তিত্বই নেই। যেমন, এই দু'-দশকে ওই অঞ্চলে প্রচুর শিল্প তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে স্টারলাইট সংস্থার টাইটানিয়াম মৌল বিশুদ্ধ করাব শিল্প রয়েছে, যা ইস্পাত শিল্পের চেয়ে ২৫ গুণ মিষ্টি জল ব্যবহার করে। কোদানকুলম নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র উৎপাদন শুরু করার পর যে উৎস থেকে মিষ্টি জল সংগ্রহ করবে, স্টারলাইট সংস্থা এখনই সেই উৎস থেকে বিপুল পরিমাণে জল নিষ্কাশন করছে। স্টারলাইট সংস্থার সব ক'টি ইউনিট যখন চালু হবে, তখনই কোদানকুলমে বাণিজ্যিক ভাবে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন করার কথা। এই বিপুল পরিমাণে মিষ্টি জল তামিলনাড়ুর ওই জলাধারটি সরবরাহ করতে পারবে না। দ্বিতীয় বিষয়টি হল, জনসংখ্যার হিসেব। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং যে পরিমাণ মানুষকে উচ্ছেদ করতে হবে বলে মনে করা হয়েছিল ১৯৮৮ সালে, সেই হিসেবের ভিত্তি ছিল ১৯৮১ সালের জনগণনা। কিন্তু ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি দশ বছরে উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। এর বাইরে রয়েছেন ২০০৪ সালে সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা। তামিলনাড়ু সরকার সুনামির ফলে গৃহহারা এক বিরাট জনগোষ্ঠীকে বিদেশি সাহায্যে কলোনি স্থাপিত করে যেখানে ''পুনর্বাসন'' দিয়েছে, সেই অঞ্চলটি আসলে কোদানকুলম নিউক্লিয়ার চুল্লির মূল অংশ থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। অর্থাৎ ইমারতি নির্মাণ শেষ হলেও এই কলোনিটিকে তার প্রায় ৩৫ হাজার অধিবাসী-সহ সরিয়ে দিতে হবে, যা কি না রাশিয়ার সাথে চুক্তির সময় সম্পূর্ণ ভাবেই অনুপস্থিত ছিল! প্রশাসনিক কাজ, জরিপের কাজ, রাস্তা এবং অন্যান্য ইমারতি-নির্মাণ খাতে ২০১০ পর্যন্ত বহু খরচ হয়ে গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, ২০১৮-১৯ নাগাদ এই চুল্লির যে ক'টা বসবে (এই সময়ের মধ্যে ক'টা বসবে, তা এখনও ভারত সরকার জানাতে পারেনি), তার জন্য ২০০৭-২০০৮ মূল্যমানে খরচ পড়তে পারে ১৪৪ বিলিয়ন টাকা!

এই কেন্দ্রের জন্য রাশিয়ার প্রায় ২৩টি সরকারি -বেসরকারি সংস্থা হাত মিলিয়ে একটি ‘কনসোর্টিয়াম’ গঠন করেছে। এরাই চুল্লির প্রস্তাবিত ২৫-৩০ বছর জীবনকাল জুড়ে এই চুল্লি-গুচ্ছের যাবতীয় যন্ত্র, চুল্লির জ্বালানি-সহ অন্যান্য সমস্ত কিছু সরবরাহ করবে। মজার বিষয় হল, এই চুল্লিতে এমন কয়েকটি যন্ত্রাংশ লাগবে, যা ভারতীয় সংস্থা ‘‘ভেল’’ সস্তায় প্রস্তুত করতে পারে এবং এই যন্ত্রাংশ তৈরির কোনও কারখানা রাশিয়ায় নেই। রাশিয়া এই যন্ত্রাংশ হয় জাপান নয় ফ্রান্স থেকে কিনে ভারতকে প্রায় ৫ গুণ দামে সরবরাহ করবে-- বস্তুত প্রথম দফায় এমন কিছু যন্ত্র ভারতে আমদানি হয়ে গিয়েছে গত দু’বছরে। রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের যে ধরনের চুক্তি, তাতে ‘‘বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যর্থতা’’-র কারণে যদি ভারত সরকার পুরো জমি রাস্তা ও অন্যান্য পরিকাঠামো-সহ রাশিয়ান সংস্থাকে ‘‘সময়মতো’’ স্থানান্তরিত করতে না-পারে, তবে প্রকল্প রূপায়ণে যে অবধারিত বিলম্ব ঘটবে এবং এর জন্য যন্ত্রপাতির যে ক্ষয়ক্ষতি হবে, তার জন্য রাশিয়া দায়ী থাকবে না। সুরক্ষার প্রয়োজনে রাশিয়া একই যন্ত্র বারবার আমদানি করতে পারে। এবং ভারত সরকারকে ওই প্রতিটি যন্ত্রের জন্য তৎকালীন মূল্যই দিতে হবে।

এই প্রকল্পের জন্য দফায় দফায় জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়। প্রথম দফায় উচ্ছেদ শুরু হয় ১৯৯০ সালে। ইতিমধ্যে ভোপাল সমঝোতা (১৯৮৯) নিয়ে হইচই শুরু হওয়ায় ১৯৯৪ সালে ভারতের পরিবেশ ও বনমন্ত্রক বলে যে, ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছর থেকে পরমাণু চুল্লি বসাতে গেলে, এই প্রকল্পের জন্য পরিবেশের ওপর প্রভাব- সংক্রান্ত রির্পোট জমা দেওয়া এবং জনশুনানির মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের মতামত গ্রহণ, ঠিক যেমনটি ১৯৮৬-র পরিবেশ আইনে লেখা রয়েছে, সেই মোতাবেক করতে হবে এবং তা বাধ্যতামূলক। কিন্তু ২০০৬-এ কোদানকুলমে কাজ শুরুর আগে এমন রির্পোট জমা দেওয়া হয়নি বা জনশুনানিও করা হয়নি।

আন্দোলনের চাপে পড়ে ২০০৭ -এর জুন মাসে এমন এক গণশুনানির আয়োজন করে ভারতের পরমাণুমন্ত্রক। সেই সম্পর্কে কিছু চাঞ্চল্যকর ঘটনা বর্ণনা করার আগে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার যে, এই কেন্দ্রের ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি ইউনিট বসার পুরো কাজের ৭৫ শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে এবং তা সংশ্লিষ্ট পরিবেশ সংক্রান্ত কোনও রির্পোট এবং জনশুনানি ছাড়াই।

২০০৭-এর ২ জুন এই জনশুনানির কথা জানাজানি হওয়াব পর, তামিলনাড়ুর উপকূলবর্তী তিনটি জেলা, তিরুনেলভেলি, তুতিকোরিন (যেখানে স্টারলাইট সংস্থার শিল্প চলছে) এবং কন্যাকুমারী থেকে প্রায় ২০০০ গ্রামবাসী জড়ো হন। যদিও এই জনশুনানি আইন মতে প্রকাশ্যে এবং উপস্থিত সবাইকে নিয়ে করার কথা, কিন্তু বিপুল পরিমাণে গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে প্রকল্পের কর্তাব্যক্তিরা ভীত হয়ে পড়েন। তাঁরা স্থানীয় পুলিশকে ‘‘আইনশৃঙ্খলা’’ রক্ষার অনুরোধ জানালে, তারা মুখোশ পরা, বর্ম পরা এ কে-৪৭ রাইফেলধারী দাঙ্গা-বিরোধী এবং ‘‘সন্ত্রাসবাদী দমন-স্কোয়াড’’ নিয়ে এসে হাজির হয় এবং জনশুনানি ক্ষেত্রটি ঘিরে ফেলে অংশগ্রহণকারীদের দিকে বন্দুক তাক করে বালির বস্তার পিছনে আত্মগোপন করে গুলি করার অবস্থান গ্রহণ করে এবং অবস্থাটি ছোটখাটো যুদ্ধক্ষেত্রের সামিল হয়ে যায়। হাজার দুয়েক লোকের জন্য ১৫০০ বর্ম পরা এ কে-৪৭-ধারী বিশেষ পুলিশ এবং আরও হাজারখানেক সাধারণ পুলিশ টহল দেওয়া শুরু করে।

ভারতের আইনমতে, প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে পরিবেশের ওপর প্রভাব-সংক্রান্ত রিপোর্টের সারাংশ এবং মূল প্রতিপাদ্য বিষয় স্থানীয় ভাষায় ছেপে বিলি করার কথা। কিন্তু শুনানিব দিন পর্যন্ত এই দুটি দলিল তামিল ভাষায় অনূদিত হয় নি। অনেক মামলা ইত্যাদি করে ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সেই রিপোর্টটি হাতে পেয়েছেন।

আইনমতে, এই জনশুনানিতে যাঁরাই বলতে চাইবেন, তাঁদেরই বলতে দিতে হবে। শুনানি শুরু হওয়ার পর দেখা গেল, প্রথম দশজন বক্তা হচ্ছেন এই প্রকল্পের ঠিকাদার, চাকুরে বা ভারতের পরমাণুমন্ত্রক-নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ। এঁদের মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দা দু’জন! এই দশ জনই প্রকল্পের সমর্থনে মূলত ইংরেজি ভাষায় বক্তব্য রাখলেন। এর পরই কালেক্টর সাহেব ঘোষণা করলেন, গণশুনানি শেষ হল— শুনানির রায়

প্রকল্পের পক্ষে গিয়েছে! এই সময়ে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জীব-বিজ্ঞানী বহু কষ্টে কালেক্টরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এই প্রকল্পের বর্জ্য জল পড়বে মান্নার উপসাগরে, যা কি না পৃথিবীর সেরা জলজ-জৈববৈচিত্র্যের জন্য বিখ্যাত! পরমাণুমন্ত্রক বলে, এই তথ্য তাদের জানা নেই, যদিও ১২ ক্লাসের বইতেই এই তথ্য রয়েছে!

এই বিষয়ে ইতি টানার আগে বলা যেতে পারে, দক্ষিণ তামিলনাড়ু হল ভারতের বায়ুশক্তি উৎপাদনের রাজধানী-স্বরূপ। এখনই এই অঞ্চল বেশ কয়েক হাজার মেগাওয়াট বায়ু-বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। উৎপাদনের হার যে হারে বাড়ছে, তার ভিত্তিতে বলা যায়, ২০১৮-১৯ নাগাদ উৎপাদিত বায়ু-বিদ্যুতের পরিমাণ কোদানকুলম নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনের ২ থেকে ৩ গুণ পরিমাণ হবে এবং খরচ হবে কোদানকুলমের খরচের ৮০ ভাগের মাত্র ১ ভাগ!

জৈতাপুরে কেলেঙ্কারি :

মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরি অঞ্চলে জৈতাপুরের মাড়ওয়ান এলাকায় ফরাসি সংস্থার আরেভা ছ'টি ইউনিটের একটি নিউক্লিয়ার চুল্লি-গুচ্ছ নির্মাণ করছে। ভারত-মার্কিন ১২৩ চুক্তি মতে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে ছ'টি চুল্লি-গুচ্ছ বসবে, এটি তার মধ্যে অন্যতম। প্রতিটি ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা হবে ১৬৫০ মেগাওয়াট!

এখানেও আমরা শুরু করি দেশের আইনকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার বিষয়টি থেকেই! পরিবেশ ও বনমন্ত্রকের চাপে পড়ে, ফরাসি সরকারের টাকা নিয়ে যে "বিশেষজ্ঞ সংস্থা" এই প্রকল্পের জন্য পরিবেশের ওপর প্রভাব বিচার-সংক্রান্ত রিপোর্ট দেয়, তা ছিল খুবই অসম্পূর্ণ। এই রিপোর্টে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য দূরীকরণ ব্যবস্থাপনার বিবরণ দেওয়া আবশ্যিক, কিন্তু সে অধ্যায়টি এই রিপোর্টে নেই। জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রকল্পের প্রভাব ইত্যাদি পরিবেশ সংক্রান্ত সমীক্ষার কোনও তথ্য, কী ভাবে বিপর্যয় মোকাবিলা করা যাবে, সে সংক্রান্ত যে বাধ্যতামূলক অধ্যায় থাকার কথা, তা এই রিপোর্টে নেই। স্বভাবতঃই, পরিবেশমন্ত্রক ৩৫টি শর্তের একটি তালিকা দিয়ে বলে, তিন মাসের মধ্যে এই সমস্ত শর্ত পূরণ করলে তবেই প্রকল্পের কাজ শুরু করা যাবে। কিন্তু ছ'মাস পরও সেই সব তথ্য জমা পড়েনি। অথচ কাজ চালু হয়েছে। জৈতাপুরে যে চুল্লিটি বসছে, পণ্ডিতি ভাষায় তার নাম হলো ইপিআর। কিন্তু এই ইপিআর প্রযুক্তিটি এখনও প্রমাণিত প্রযুক্তি নয়। এই প্রজন্মের প্রযুক্তির অনেক খুঁত আছে এবং তা প্রতিদিনই ধরা পড়ছে। এই প্রযুক্তির চুল্লি সারা পৃথিবীতে কোথাও এখনও সফল ভাবে চলেনি। ফ্রান্সের সংস্থা আরেভা এখনও পর্যন্ত চারটি এমন চুল্লির বরাত পেয়েছে। এর মধ্যে চিন নিচ্ছে দুটি— প্রযুক্তিগত খুঁতের জন্য রূপায়ণ পিছিয়েছে দু'বছর। কোনও ব্যাংক এই প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে না। তিনটি ব্যাংক তাদের প্রতিশ্রুতি ফিরিয়ে নিয়েছে। চিন বলে দিয়েছে যে, তারা এই চুল্লির প্রযুক্তিগত ১০০০টি খুঁত ধরতে পেরেছে। এই খুঁত মেরামত না করলে ২০১১ সালের শেষে তারা বরাত প্রত্যাহার করে নেবে। অন্য একটি চুল্লি নেওয়ার কথা ফিনল্যান্ডের। কিন্তু সেখানে প্রকল্পটি ৪২ মাস পিছিয়ে আছে। পরীক্ষামূলক ভাবে চালাতে গিয়ে ফিনল্যান্ডে প্রকল্পটি চলেনি। যেখানে জ্বালানি ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বলা হয়েছিল ১০ শতাংশ, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সেই ব্যর্থতার পরিমাণ ২০-৩০ শতাংশ। একমাত্র ভারত সরকার জোর গলায় বলেছে, তারা ঐ ত্রুটিপূর্ণ নকশাই কিনবে— বরং আরেভা সংস্থা ভারতের ওপর দিয়ে তাদের প্রযুক্তিটি নিখুঁত করুক।

অন্য একটি বিষয় বলে এই নিবন্ধ শেষ করা যেতে পারে। ভারতে যে সব চুল্লি চালু আছে সেগুলো মাত্রার দিক থেকে আরেভার চুল্লির চেয়ে প্রায় আটগুণ ছোট এবং সেগুলো মূলতঃ পিএইচডব্লুবিআর বা ভারি জলের চুল্লি। কিন্তু ভারত এখন কিনতে চাইছে হালকা জলের চুল্লি। প্রথমতঃ, এই সিদ্ধান্তের ফলে এতদিন ধরে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ভারি জলের চুল্লির পিছনে ব্যয় করা হয়েছে তা জলে যাবে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের প্রযুক্তিবিদদের এত বড় হালকা জলের চুল্লি চালানোর অভিজ্ঞতা নেই। আরেভা বলেই দিয়েছে, চুল্লি চালু হলে তাদের প্রযুক্তিবিদদের তারা ফিরিয়ে নেবে--রক্ষণাবেক্ষণের দায় বর্তাবে ভারতীয়দের ওপর। যখন এই জাতীয় চুল্লিগুলো রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্ন আসবে, তখন আমাদের দেশে এই বিষয়ে শিক্ষিত প্রযুক্তিবিদ তৈরি হবে না। আবার এখন পৃথিবীর কোথাও এই জাতীয় চুল্লি চালু নেই বলে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের সুযোগও সীমাবদ্ধ। একে অপ্রমাণিত প্রযুক্তি, অন্য দিকে অপ্রতুল রক্ষণাবেক্ষণ। জৈতাপুর তাই ভারতের জনগণের জন্য এক অবশ্যম্ভাবী টাইম বোমা, কবে ফাটবে সেই আতঙ্কে দিন কাটানোর পালা।

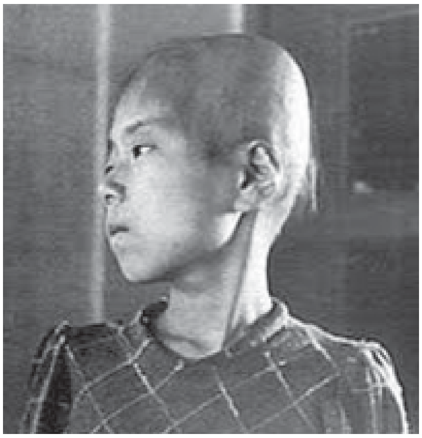

হিরোসিমায় পরমাণু বোমার শিকার

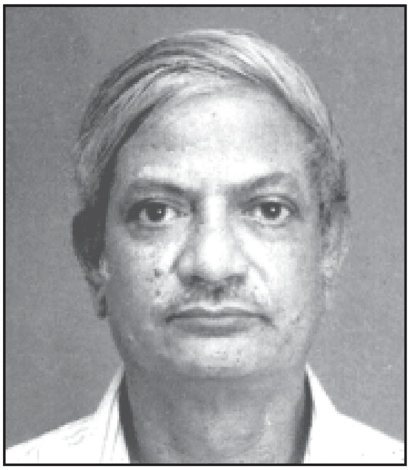

স্মরণে : ডা. সুজিত কুমার দাশ

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

২০ এপ্রিল, ২০১১, হারিয়ে গেলেন জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, ডা. সুজিত কুমার দাশ। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

আমরা যারা ৮০-র দশকের জুনিয়র ডাক্তার, তারা ডা. দাশকে দেখেছি অল বেঙ্গল জুনিয়র ডাক্তার ফেডারেশনের আন্দোলনের সময় হেল্‌থ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা হিসেবে, আমাদের আন্দোলনের সহায়ক রূপে। দেখেছি ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ-এর সংগঠক হিসাবে। "ওযুধের জন্য মানুষ, না মানুষের জন্য ওযুধ?" -- এই প্রশ্নে জনসাধারণের পাশাপাশি ডাক্তার ও ডাক্তারি ছাত্রদের আন্দোলিত করতে। ভূপাল গ্যাস-কাণ্ডের পর গ্যাস- পীড়িতদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোয় আমাদের সঙ্গী ছিলেন ডা. দাশ, আমাদের শিক্ষক হয়েও যিনি আমাদের সুজিতদা।

১৯৩৭-এর ১৪ জানুয়ারি সুজিতদার জন্ম। আর.জি.কর মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় তিনি বামপন্থী মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। স্নাতকোত্তর শিক্ষা চর্মরোগ বিদ্যায়। শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন আর.জি.কর মেডিক্যাল কলেজে। সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার এক সদস্য হিসেবে ডা. দাশ ব্যথা পেতেন এই ব্যবস্থার জনবিরোধী ও দুর্নীতিপূর্ণ চেহারায়। ১৯৭২ -এ সরকারি ডাক্তারদের একমাত্র সংগঠন, 'হেল্‌থ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে তোলার অন্যতম কারিগর ছিলেন তিনি। ১৯৭৪ -এ ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের ৪১ দিনের কর্মবিরতি তৎকালীন সরকারকে বাধ্য করে প্রশাসনে প্রযুক্তিবিদদের গুরুত্ব মেনে নিতে। ১৯৭৫ -এ জরুরি অবস্থার সময় শোধ তোলে সরকার, আরও কয়েকজন চিকিৎসক নেতার সঙ্গে বরখাস্ত হন ডা. দাশও। ১৯৭৭ -এ জরুরি অবস্থার অবসানের পর সরকারি চিকিৎসক ও ডাক্তারি ছাত্রদের আন্দোলনের চাপে তাঁদের চাকরিতে পুনর্বহাল করে বামফ্রন্ট সরকার।

বামফ্রন্ট ভেবেছিল এইচ.এস.এ.---কে তাঁবে রাখা যাবে। ১৯৭৪ -এ ডাক্তারদের যে দাবিগুলোর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল সংসদীয় বাম দলগুলো, ১৯৮০ সালে বামফ্রন্ট সরকার সেই দাবিগুলোর বিরোধিতা শুরু করল। আর আক্রমণ তীব্র হল জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের জনমুখী দাবিগুলোর প্রতি এইচ.এস.এ.-র নেতৃত্ব খোলাখুলি সমর্থন জানানোর পর। এইচ.এস.এ. ভেঙে তৈরি হল অ্যাসোসিয়েশন অফ হেল্‌থ সার্ভিস ডক্টরস্। শাস্তি, বদলি, প্রলোভন ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে সরকারি ডাক্তারদের অধিকাংশকে বাধ্য করা হল নতুন সংগঠনে যোগ দিতে। সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়েও এইচ.এস.এ. ডা. দাশের নেতৃত্বে মূল্যবোধ-সম্পন্ন সৎ চিকিৎসকদের সংগঠন হিসেবে টিকে থেকেছে।

পেশাগত সংগঠন ছাড়াও তিনি থেকেছেন সমাজমনস্ক চিকিৎসকদের এক সর্বভারতীয় সমন্বয় 'মেডিকো ফ্রেন্ডস্ সার্ক্‌ল'-এর সঙ্গে। যুক্তিসঙ্গত ওষুধ-নীতির দাবিতে গড়ে তুলেছেন ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ। অল ইন্ডিয়া ড্রাগ অ্যাকশন নেটওয়ার্কের অন্যতম সংগঠনে থেকেছেন। ভূপাল গ্যাস-কাণ্ডের পর গড়ে তুলেছেন 'নো মোর ভোপাল কমিটি'। ভূপাল গ্যাস-কাণ্ড নিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়-নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ কমিটির দুই বেসরকারি বিশেষজ্ঞের একজন ছিলেন ডা. দাশ।

এইচ.এস.এ. দুর্বল, ১৯৮৯-'৯০ এ ড্রাগ অ্যাকশন ফোরামে ভাঙন, ১৯৯৭ সালে ড্রাগ-ডিজিজ-ডক্টর পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সুজিতদা কিছুটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছিলেন। তার ওপর ছিল মধুমেহ, বৃক্কের কর্কট রোগ, হার্ট অ্যাটাক আর ছানির আক্রমণ।

তবু সমাজ-সচেতন মানুষটি থেমে থাকেননি। তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের ফতোয়ার বিপক্ষে ঝলসে উঠেছে তাঁর লেখনী, 'In Defence of Taslima Nasreen'।

গ্রামীণ ক্ষেতমজুর হাকিম শেখকে মরণাপন্ন অবস্থায় পাঁচটা সরকারি হাসপাতাল ফিরিয়ে দেয়। হাকিম শেখ বেঁচে যান এক

❑ *শেষাংশ ২৭ পাতায়*

জরায়ুমুখের ক্যানসার কী ভাবে আটকাবেন

ডা. চঞ্চলা সমাজদার, এম. বি. বি. এস., ডি. জি. ও.

নারীদের যতরকম ক্যানসার বেশি হয়, সার্ভাইক্যাল ক্যানসার বা জরায়ু-মুখ ক্যানসারের স্থান তার মধ্যে তৃতীয়। সারা বিশ্বে বছরে পাঁচ লাখেরও বেশি মহিলা এই রোগে আক্রান্ত হন। ভারতবর্ষেই বছরে প্রায় দেড় লাখ মহিলার মধ্যে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ দেশে এই ক্যানসারে বছরে প্রায় ৭৪ হাজার মহিলা মারা যান, যা সারা বিশ্বে এই রোগে মৃত্যুর এক চতুর্থাংশের বেশি। স্বাভাবিক ভাবেই রোগ প্রতিরোধে ভ্যাক্সিন ব্যবহার করে, বা অন্য কোনও ভাবে এত সংখ্যক মহিলার মৃত্যু আটকানো যায় কি না, এবং এই রোগ প্রতিরোধের জন্য আমরা কী কী করতে পারি, তা আজকের এক জ্বলন্ত প্রশ্ন।

ভারতবর্ষে হাসপাতালে ভর্তি ক্যানসার-আক্রান্ত মহিলাদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ ভোগেন জরায়ু-মুখ ক্যানসারে। এঁদের মধ্যে আবার উনিশ শতাংশের রোগ ধরা পড়েছে ক্যানসারের একেবারে শেষ পর্যায়ে। এর উত্তর খোঁজার আগে আমাদের জানা দরকার সার্ভাইক্যাল ক্যানসার কেন হয়, কী ভাবে হয় এবং কী ভাবেই বা এই রোগ নির্ণয় তাড়াতাড়ি করা সম্ভব।

সার্ভিক্স বা জরায়ু-মুখ হল ইউটেরাস বা জরায়ুর একেবারে নীচের অংশ, যা কি না ভ্যাজাইনা বা যোনির উপর ভাগে গিয়ে উন্মুক্ত হয়েছে। এই ছিদ্র দিয়েই ঋতুস্রাব-কালীন রক্ত যোনিদ্বারে এসে পৌঁছয়। আবার যৌন মিলনের সময় জরায়ু-মুখটি পুরুষাঙ্গের খুব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে। শিশুর জন্মের সময় এই জরায়ু-মুখই প্রসারিত হয়ে বাচ্চাকে বাইরে আসতে সাহায্য করে। অর্থাৎ মহিলাদের শরীরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এটি। এবং এই শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়াগুলি ঘটার সময় নানা ভাবে জরায়ু-মুখে ক্ষত এবং প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু তা সহজে গোচরে আসে না, কারণ এটি একটি অভ্যন্তরীণ অঙ্গ। উপরন্তু এটি একটি গোপন অঙ্গ। লিভার বা পাকস্থলীর সমস্যায় মহিলারা যত তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের কাছে স্বচ্ছন্দ হন, এখানকার সমস্যায় তা হতে পারেন না।

> সারা বিশ্বে বছরে পাঁচ লাখেরও বেশি মহিলা সার্ভাইক্যাল ক্যানসারে আক্রান্ত হন। শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই বছরে প্রায় চুয়াত্তর হাজার মহিলা সার্ভাইক্যাল ক্যানসারে মারা যান।

প্রফেসর হেরাল্ড জার হুসেনের গবেষণায় জানা গিয়েছে, প্রায় ৯৯ শতাংশ সার্ভাইক্যাল ক্যানসারের ক্ষেত্রেই এইচ.পি.ভি বা হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের সংক্রমণই দায়ী। এই ভাইরাসটি যৌন সংসর্গের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়। কিন্তু এর মানে মোটেই এই নয় যে, এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটলেই জরায়ু-মুখের ক্যানসার হবে। মহিলাদের এইচ.পি.ভি সংক্রমণের পর প্রায় ৭০ ভাগ ক্ষেত্রে এক বছরের মধ্যে সংক্রমণ চলে যায় ও ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে দু'বছরের মধ্যে চলে যায়। বাকি ৫ বা ১০ ভাগ ক্ষেত্রে সংক্রমণ থেকে যায় এবং তা পরবর্তী কালে জরায়ু-মুখ ক্যানসার সৃষ্টি করে। যে সমস্ত উপাদান (Factor) এই সংক্রমণকে ক্যানসারের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে তা হল, অল্প বয়সেই সহবাসে লিপ্ত হওয়া, একাধিক যৌন সঙ্গী থাকা, অল্প বয়সেই বিবাহ এবং অনেকবার সন্তান ধারণ করা বা গর্ভপাত করা, যৌনাঙ্গের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা না-করা, দীর্ঘ দিন যাবৎ হরমোনাল

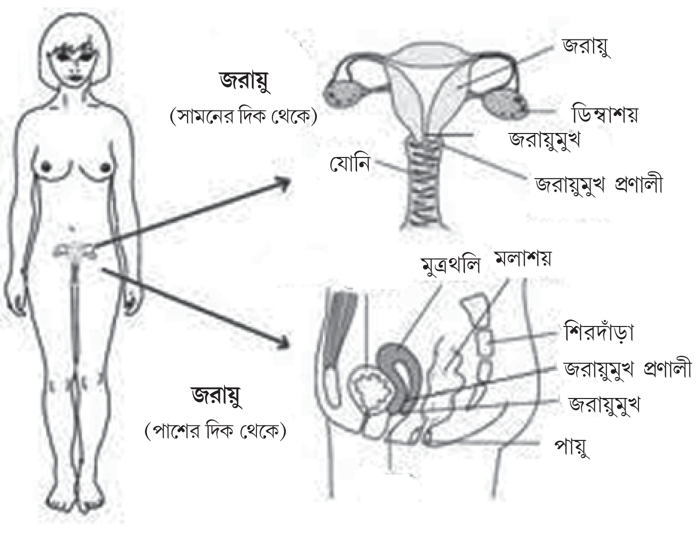

গর্ভনিরোধক ট্যাবলেট ব্যবহার করা, ধূমপান করা, দীর্ঘকালীন প্রদাহ, এইচআইভি সংক্রমণ ইত্যাদি, এবং অবশ্যই দারিদ্র্য। যার ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সার্ভাইক্যাল ক্যানসারের প্রকোপ অনেক বেশি।

এখন প্রশ্ন হল, প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগ-নির্ণয় কী ভাবে করা সম্ভব? যে সময়ে রোগীর শরীরে লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে শুরু করে, তখন কিন্তু রোগ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। এই লক্ষণগুলি হল: সহবাসের পরে রক্তস্রাব, অনিয়মিত রক্তস্রাব, দুর্গন্ধযুক্ত সাদা স্রাব, ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার অনেক দিন পর আবার যোনীপথে রক্তস্রাব ইত্যাদি। স্বাভাবিক ভাবেই এই সময়ে চিকিৎসা শুরু হলে সাফল্য আসবে অনেক কম। কিন্তু কতগুলি রুটিন পরীক্ষার মাধ্যমে জরায়ু-মুখের কোষের যে অস্বাভাবিক অবস্থা বা প্রাক্-ক্যানসার ক্ষত তৈরি হয়, তা ধরতে পারা যায়। সেই অবস্থাতেই যদি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করা যায়, তবে তা আর ক্যানসারে পরিণত হতে পারে না। যে রুটিন পরীক্ষা গুলির দ্বারা প্রাক্ ক্যানসার ক্ষত নির্ণয় করা সম্ভব তা হল--

১) ভি.আই.এ (ভিস্যুয়াল ইন্সপেক্সন উইথ অ্যাসেটিক অ্যাসিড)-- এটি প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর দ্বারা করা সম্ভব। জরায়ু-মুখে অ্যাসেটিক অ্যাসিডের প্রলেপ দেওয়ার পরে কোনও অংশে সাদা বর্ণ ধারণ করলে, ধরে নেওয়া যেতে পারে প্রাক্ ক্যানসার ক্ষত রয়েছে।

২) ভি.আই.এল.আই (ভিস্যুয়াল ইন্সপেক্সন উইথ লুগলস্ আয়োডিন) -- জরায়ু-মুখে আয়োডিনের প্রলেপ লাগানোর পর সেই অংশ গোলাপী বর্ণ ধারণ করলে, ধরে নেওয়া যেতে পারে প্রাক্ ক্যানসার ক্ষত রয়েছে।

৩) প্যাপ টেস্ট-- জরায়ু-মুখের কোষের নমুনা সংগ্রহ করে প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে তা পরীক্ষা করে দেখা হয়।

৪) এইচ.পি.ভি. -ডি এন এ টেস্ট -- ল্যাবরেটরিতে নমুনা সংগ্রহ করে সংগৃহীত নমুনায় হিউম্যান প্যাপলোমা ভাইরাসের ডি.এন.এ-র উপস্থিতি দিয়ে প্রমাণ হয় ভাইরাসের সংক্রমণ। তবে এটি বেশ খরচসাপেক্ষ এবং সাধারণ মানুষের রুটিন টেস্টের পক্ষে উপযোগী নয়। এতে ভাইরাস সংক্রমণ হয়েছে এ টুকুই বোঝা যায়, কিন্তু তার থেকে সার্ভাইক্যাল ক্যানসার হয়েছে তা বোঝা যায় না।

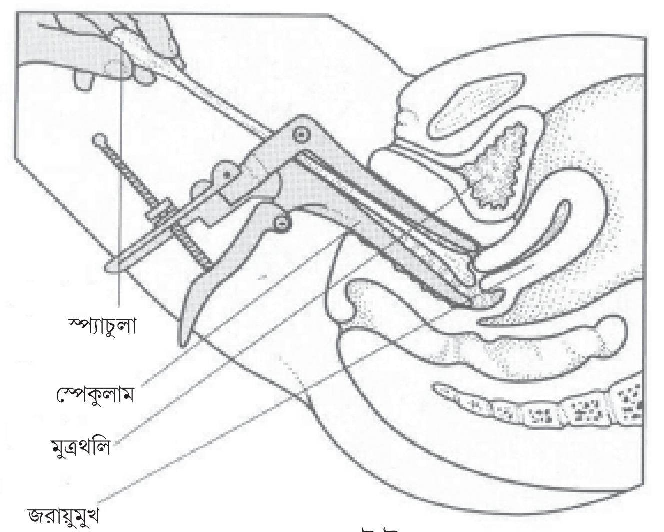

প্যাপ টেস্ট

৫) কল্পোস্কোপি ও বায়োপ্সি --- এখানে কল্পোস্কোপ নামক যন্ত্র ব্যবহার করে জরায়ু-মুখ দেখা হয় এবং সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে তা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়।

বিবাহিতা, বিশেষত বহু সন্তানের জননীদের এ রোগের সম্ভাবনা বেশি। গণিকা বা বহুগামী মহিলাদের ক্ষেত্রেও এ সম্ভাবনা অনেক বেশি। তাঁদের ক্ষেত্রে এই সমস্ত নির্ণায়ক পরীক্ষাগুলির কোনও একটি বা দুটি যদি রুটিন মাফিক করা হয়, তা হলে প্রাথমিক অবস্থাতেই জরায়ু-মুখের কোষের অস্বাভাবিকতা নির্ণয় করা যায় এবং উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়। জরায়ু-মুখের কোষের অস্বাভাবিকতা, যেগুলি প্যাপ টেস্ট বা কল্পোস্কোপি বায়োপ্সির মাধ্যমে ধরা পড়ে, তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল বিভিন্ন স্তরের প্রাক্-ক্যানসার ক্ষত বা প্রাথমিক পর্যায়ের ক্যানসারও।

জরায়ু-মুখের এই সমস্ত প্রাক্-ক্যানসার ক্ষতগুলিকে কতগুলি পদ্ধতির সাহায্যে চিকিৎসা করাতে পারলে ভবিষ্যতে তা থেকে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এই পদ্ধতিগুলি হল -- ক্রায়োথেরাপি, কোনাইজেন, লিপ। কিন্তু, এগুলির জন্য প্রয়োজন গণ-সচেতনতা এবং সরকারি তরফে সদিচ্ছা। সরকারি এবং বেসরকারি তরফে প্রচারাভিযান চালিয়ে জরায়ু-মুখের রুটিন নির্ণায়ক পরীক্ষাগুলি করানোর প্রয়োজনীয়তা বোঝানো, সার্ভাইক্যাল ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে কমানোর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমাদের দেশে শিক্ষিত এবং ওয়াকিবহাল মহিলাদের মধ্যেও এ ব্যাপারে সচেতনতা একেবারেই কম। আর অনগ্রসর শ্রেণি, শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া, পর্দানশীন পরিবারগুলির মহিলাদের ক্ষেত্রে ক্যানসারের লক্ষণ শুরু হওয়ার আগেই ডাক্তারের সাহায্য নেওয়া আশা করাই যায় না। অথচ, যে সমস্ত দেশে প্রাক্ ক্যানসার নির্ণয়ের জন্য সুসংহত প্রকল্প রয়েছে, সেখানে সার্ভাইক্যাল ক্যানসার প্রায় আশি শতাংশ কমিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

এক কথায় বলতে গেলে, জরায়ু-মুখ ক্যানসার তথা সার্ভাইক্যাল ক্যানসার আটকাতে গেলে আমাদের যে সব দিকে নজর দেওয়া দরকার, তা হল ----

- মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হওয়া রোধ করা।
- বহুবার সন্তানধারণ বা গর্ভপাত না-করা।
- স্ত্রী-যৌনাঙ্গের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
- যৌনসঙ্গী একজন মাত্র হওয়াই কাম্য।
- গর্ভনিরোধ বড়ি বেশি দিন না-খাওয়া (কনডোম বা বন্ধ্যাকরণ অপারেশন -- এই সব বিকল্প চলতে পারে)।
- ঝুঁকিপূর্ণ যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কনডোম ব্যবহার করা।
- ধূমপান বা যে কোনও ভাবে তামাক-সেবন বর্জন।
- যৌনাঙ্গে যে কোনও সংক্রমণ জ্বালা, প্রদাহ ইত্যাদি হলে দ্রুত চিকিৎসা।

এগুলো করার ক্ষেত্রে মূল বাধা হল দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব ও পরিবারে মেয়েদের নীচু জায়গা বা পরাধীনতা। ক্যানসার রোধ করতে গেলে এগুলো নিয়েও ভাবতে হবে। আর চিকিৎসাব্যবস্থা এ রোগ প্রতিরোধে যে ভাবে কাজে আসতে পারে, তা হল—

- নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রজননক্ষম সমস্ত মেয়েদের জরায়ু-মুখ পরীক্ষা- অ্যাসিটিক অ্যাসিড/লুগল্স্ আয়োডিন লাগিয়ে পরীক্ষা, এবং সবচেয়ে ভালো হয় যদি প্যাপ টেস্ট করা যায়।
- দরকার হলে ক্ষেত্রবিশেষে কল্‌পোস্কোপি ও বায়োপ্‌সি।
- এ সব পরীক্ষায় যদি জরায়ু-মুখের প্রাক্-ক্যানসার ক্ষতের কোনও দিক দেখা যায় তো কোনাইজেশন, ক্রায়োথেরাপি বা লিপ -- এ রকম পদ্ধতিতে তাকে সারিয়ে তোলা, যাতে ক্ষতটি ক্যানসার হয়ে উঠতে না-পারে।

এতে কি সমস্ত জরায়ু-মুখ ক্যানসার আটকানো যাবে? না, তা যাবে না। তবে অনেক ক্ষেত্রেই আটকানো যাবে। আর তার ফলে বেঁচে যাবে লক্ষ লক্ষ প্রাণ।

সার্ভাইক্যাল ক্যানসার এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে এইচ.পি.ভি (হিউম্যন প্যাপিলোমা ভাইরাস — HPV) ভ্যাক্‌সিনের অবস্থান — এই বিষয়টি এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। কারণ, বিভিন্ন মহল থেকে বেশ কিছু দিন যাবৎ সার্ভাইক্যাল ক্যানসারের প্রতিষেধক হিসেবে এইচ.পি.ভি ভ্যাক্‌সিনের প্রচলনের জন্য চাপ আসছে। কিছু জায়গায় ইতিমধ্যেই এর প্রয়োগ শুরু হয়েও গিয়েছে। কিন্তু বিষয়টি বিতর্কিত এবং এই ভ্যাক্‌সিনটি কতটা মানুষের কাজে লাগবে, আর কতটা ওষুধ কোম্পানির সুবিধা করে দেবে, সেই ব্যাপারটা এখন প্রশ্নের সম্মুখীন। আমরা আগামী সংখ্যায় এ নিয়ে আলোচনা করব।

ডা. সুজিত কুমার দাশ স্মরণে

(❑২৪ পাতার পর)

বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসায়। সংশ্লিষ্ট সরকারি ডাক্তারদের শাস্তি ও স্বাস্থ্যের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে ঘোষণা করার আর্জি নিয়ে উচ্চতম আদালতে মামলা করে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতি। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ অবধি চলা এই মামলায় সমিতিকে পরামর্শ ও নেতৃত্ব দেন ডা. দাশ। অবশেষে ১৯৯৬ সালে স্বাস্থ্যের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি না-পেলেও চিকিৎসা, বিশেষতঃ জরুরি চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার সারা দেশে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পায় উচ্চতম আদালতের রায়ে।

দরিদ্র শিল্পী বসন্ত জানার সারা জীবনের শিল্পকর্ম আত্মসাৎ করেছিলেন বিখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়। ডা. দাশ এই তঞ্চকতার প্রতিবাদে লেখেন — 'শিল্প রহস্য : বসন্ত জানার কথা।'

অকৃতদার ডা. সুজিত কুমার দাশ একা থাকতেন। পা পিছলে পড়ে তাঁর মাথায় আঘাত লাগে। তাঁর দীর্ঘ দিনের সহযোদ্ধা ডা. ফনী মন্ডল, ডা. হীরালাল কোঙার, ডা. আর.পি.সিং - এর প্রয়াস তাঁকে বাঁচাতে পারেনি। ডা. দাশ মরণোত্তর দেহদানের সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর করে গিয়েছিলেন। ২১ এপ্রিল বেলা ১২টা নাগাদ তাঁর মরদেহ তুলে দেওয়া হয় মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগের হাতে।

ডা. দাশ চলে গিয়েছেন। রেখে গিয়েছেন তাঁর সহযোদ্ধাদের, যাঁরা তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে শোষণের বিরুদ্ধে, সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে চলবেন।

আলমা-আটা'র ৩০ তম বার্ষিকী

আলমা-আটা ছাড়িয়ে ভাবনা

ডা. বিনায়ক সেন, এম. ডি.

I should have done something else...
Done something else, other than going on screaming,
While struggling on in this terrifying society,
I should have done something else.
Day after day I watched a tiny hope
Going into something like a huge pair of jaws
Carrying around with me, in this widespread famine,
The shame of having stayed alive...
I should have done something.
- Raghuvir Sahay;
translated by Binayak Sen

(আমার অন্য কিছু করা উচিত ছিল ....
এই আর্তনাদের চাইতে আলাদা, অন্য কিছু, ভয়ানক এই সমাজের মুখোমুখি সংগ্রামে দাঁড়িয়ে,
আমার অন্য কিছুই করা উচিত ছিল।
আমার চোখের সামনে দিনের পর দিন
ব্যদিত ভয়ানক বিবর যখন গ্রাস করছিল ছোট্ট একচিলতে আশাকেও
আর আমাকে বানিয়ে তুলছিল তার বীভৎস বুভুক্ষার সাথী,
বেঁচে থাকাটাও যেন ঘেন্নার ...
কিছু আমার করা উচিত ছিল।
--- রঘুবীর সহায়)

'২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য'। ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে

আলমা-আটা ঘোষণার এমন উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি ছিল ওপরের ওই কবিতার 'ছোট্ট একচিলতে আশা'র মতো। কাজাখস্তানের যে জায়গাটিকে বর্তমানে 'আলমাটি' বলে, সেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা নিয়ে সে সময় যে আন্তর্জাতিক অধিবেশন ডাকা হয়েছিল, সেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তৎকালীন মহানির্দেশক হাল্ফডান মাহলার (Halfdan Mahler) - এর উৎসাহব্যঞ্জক তত্ত্বাবধানে রচিত ওই ঘোষণাপত্রের সাহসী ভাষা তখন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। আজ তার প্রায় বছর তিরিশ পর সেই ঘোষণার পথনির্দেশক শক্তি যেন নিজেই পথ হারিয়ে ফেলেছে। ২০০৩ সালে প্রকাশিত পল ফ্রেমারের 'প্যাথোলজিস অফ পাওয়ার: হেলথ্, হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড দ্য নিউ ওয়ার অন দ্য পুওর', (বার্কলে, ক্যালিফোর্নিয়া: ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস) বইটি আলমা-আটা বা মাহলার, এমনকী, প্রাথমিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা, যা ওই অধিবেশনের মূল বিষয় ছিল, তার কোনও উল্লেখই করে না।

কল্পস্বর্গ-সুলভ ইচ্ছাপূরণ :

তবু ওই ঘোষণাটি আজও মনযোগ আকর্ষণ করে। কারণ, তা সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে বিশ্বের সব মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও সুরক্ষার জন্য সকল প্রশাসক, স্বাস্থ্য ও উন্নয়নকর্মী এবং "বিশ্ব কমিউনিটি" (সে জিনিসটা যা-ই হোক না কেন) -- এদের সবাইকে জরুরি কাজের তাগিদ দিয়েছিল। এই অধিবেশন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, "স্বাস্থ্য কেবলমাত্র অসুখ বা বিকলাঙ্গতার অনুপস্থিতি নয়, বরং শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে সম্পূর্ণ ভালো থাকা এবং তা মানুষের মৌলিক অধিকার।" সে জন্য স্বাস্থ্যের নিজস্ব ক্ষেত্র ছাড়াও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পদক্ষেপের প্রয়োজন পড়ে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বা একই রাষ্ট্রের ভিতর, মানুষের স্বাস্থ্যের অবস্থায় যে ভয়াবহ পার্থক্য তা রাজনৈতিক ভাবে, সামাজিক ভাবে ও অর্থনৈতিক ভাবে মানা যায় না বলে ওই ঘোষণা দেখিয়ে দিয়েছিল। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে স্বাস্থ্য-জনিত ফারাক কমানোর দিকে পুরো মনযোগ দেওয়ার প্রয়োজনের কথাও সেখানে বলা হয়েছিল। তাতে যেমন উল্লেখিত হয়েছিল, দেশের মানুষের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব সরকারের, অন্য দিকে এ-কথাও বলা হয়েছিল, "জনগণের নিজস্ব স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও রূপায়ণে তাঁদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে অংশগ্রহণের অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে।" ৫,৬, ও ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে

প্রাথমিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও তার অর্থ এবং ৮ নম্বর অনুচ্ছেদে কী ভাবে তার কাজ করা হবে, তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। এই অনুচ্ছেদগুলি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করার যোগ্য----

"সামগ্রিক জাতীয় স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে এবং স্বাস্থ্য ছাড়া অন্য খাতের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রাথমিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা চালু করতে ও তা বজায় রাখতে সমস্ত রকমের জাতীয় নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত। এটা করতে **রাজনৈতিক সদিচ্ছা** কাজে লাগাতে হবে, দেশের সম্পদ ব্যবহার করতে হবে ও বাইরের সম্পদকে যুক্তিসংগত ভাবে ব্যবহার করতে হবে।" (মোটা হরফ যোগ করা হয়েছে)

আমার বিশ্বাস এই ঘোষণার সমস্যার মূল এখানেই, এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতির ব্যর্থতার মূল কারণও এটাই। ঘোষণার রচয়িতারা ব্যাপক সামাজিক কারিগরির বিরাট কামান দাগার পরিকল্পনা নিলেন, কিন্তু সে কামানের ঘোড়া টেপার দায়িত্বে রাখলেন এক একলা ঘোড়সওয়ার "রাজনৈতিক সদিচ্ছা" --কে। রাষ্ট্রসংঘের শিশু-ভাণ্ডার (ইউনিসেফ) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা -- এই দুইয়ের আয়োজিত বৈঠককে উপস্থিত আন্তর্জাতিক শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে বলতে গিয়ে মাহলার যে রাজনৈতিক কোনও প্রক্রিয়ার ঠিকঠাক ধারণায় পৌঁছতে পারবেন এমনটা ভাবাই বোধ হয় বাড়াবাড়ি। সুতরাং, আমরা কল্পস্বর্গসুলভ ইচ্ছাপূরণের তালিকা পেলাম, এবং আশা করতে শুরু করলাম যে সংকট মুহূর্তে দৈবের হস্তক্ষেপ চলে আসবে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার ভিত ক্ষইয়ে দেওয়া :

আলমা-আটা ঘোষণাপত্রের একদম শেষ পর্যন্ত একেবারে 'দন কিহোতে' --সুলভ উদ্দেশ্যের নিখাদ প্রদর্শন দেখা যায়। আমরা

WORLD HEALTH DECLARATION

যখন পড়ি, "একটা গ্রহণযোগ্য স্বাস্থ্যব্যবস্থা ... পাওয়া যেতে পারে ... পৃথিবীর সম্পদের পূর্ণতর ও মহত্তর ব্যবহারের দ্বারা ... যার বৃহৎ অংশ এখন অস্ত্রের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে ...", তখন এ-কথার যুক্তির প্রশংসা করি, কিন্তু মঞ্চের বাইরে বিদ্রূপাত্মক হাসি শুনি --- নাটের গুরুরা কাজে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কেননা যে মুহূর্তে আলমা-আটা অধিবেশন শেষ হয়, সেই মুহূর্তে প্রাথমিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার ধারণার ওপর আক্রমণ নামে। 'নির্বাচনাত্মক প্রাথমিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার' নতুন ধারণাটি আনা হয়, যাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার যে সংস্থানগুলো পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত বাচ্চাদের মৃত্যুহার কমাতে সবচেয়ে বেশি কাজে লেগেছিল, কেবল সেগুলোরই পক্ষে ওকালতি করা হয়, আর সামগ্রিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার ধারণাটিকে বড্ড আদর্শবাদী, খরচ-সাপেক্ষ, এবং শেষ বিচারে অসম্ভব বলা হয়। জন জে. হল ও রিচার্ড টেলার ("Health for All Beyond 2000 : The Demise of the Alma-Ata Declaration and Primary Health Care in Developing Countries", *Med J Aust, 178* (1) : 17-20, 2003) যেমন আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, যুক্তিটা ছিল এই রকম, বাচ্চার বৃদ্ধির উপর নজরদারি, ডায়েরিয়ায় মুখে খাওয়ার লবণ-চিনি-জল, মায়ের দুধ, আর টিকাদান --- এ সব দিয়েই কম খরচে বেশি কাজ পাওয়া যাবে।

ভারতে আবার প্রাথমিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার এই 'নির্বাচনাত্মক' অভিমুখের সঙ্গে তার অংশ হিসেবে ছিল পরিবার পরিকল্পনার কাজকর্ম ও জবরদস্তিমূলক পরিবার পরিকল্পনার প্রচার। খাড়াখাড়ি ভাবে একীভূত 'নির্বাচনাত্মক প্রাথমিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা'-র লাভ-লোকসানের হিসেব দিয়ে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ও রোগ চিকিৎসার বিষয়গুলো সুবিধেজনক ভাবে প্রাইভেট সেক্টরের হাতে তুলে দেওয়া হল এবং তার মানে দাঁড়াল গরিবের জন্য কোনও ব্যবস্থাই নেই। আমাদের নীতিনির্ধারক ও পরিকল্পনাকারেরা সুবিধেজনক ভাবে ভুলে গেলেন, বড়-ছোট সব রকমের স্বাস্থ্য-উদ্যোগ শুধু সুবিধে আর পরিষেবা বিনিময়ের একটা ক্ষেত্রই নয়, তা সাম্য ও ন্যায়ের মতো মূল্যবোধে বিশ্বাস পুনঃস্থাপনের বা অস্বীকার করার ক্ষেত্রও বটে, আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেটা অস্বীকার করাটাই ঘটে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০০০ সালের রিপোর্টে 'স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাঃ সম্পাদনে উন্নতি' --- এই শিরোনামে প্রাথমিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার ব্যর্থতার দায়ভার অপর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ এবং সকল স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের অপ্রতুল পরিশিক্ষণ, প্রয়োজন মতো যন্ত্রপাতির অভাব --- এ সবের ঘাড়েই চাপানো হল। রিপোর্ট অনুসারে, এরই ফলে পরিষেবা হয় নেই বা অতি অল্প। আর তারই ফল হল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার সাংগঠনিক শ্রেণিক্রমে (হাইয়ারার্কিতে) রোগী 'রেফার' করার ব্যবস্থা অকেজো হয়ে গিয়েছে।

এরই মধ্যে বিশ্বব্যাংক তার ভারতীয় সহযোগীদের নিয়ে আমাদের স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম বা গঠনগত সংস্কার গলাধঃকরণ করাতে শুরু করেছে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এর রূপ হল ''স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সংস্কার''। বিশ্বব্যাংকের ১৯৯৩ সালের 'বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনঃ স্বাস্থ্যের জন্য বিনিয়োগ' -- এই প্রতিবেদনটিকে পশ্চাৎপটে রাখা হচ্ছে। সরকারি ক্ষেত্রের গুরুত্ব কমিয়ে, বা একেবারে নাকচ করে দিয়ে বেসরকারি ক্ষেত্রের স্বাস্থ্য-উদ্যোগের উপরে জোর দেওয়ার শুরু এখান থেকে। এর ফল হল, এই দারিদ্র্য-পীড়িত দেশে স্বাস্থ্যখাতে মোট খরচের শতকরা আশি ভাগ মানুষকে নিজের পকেট থেকে দিতে হয়, আর আজ এটাই ব্যক্তিগত দেনার সবথেকে বড় কারণ। এর পাশাপাশি চলছে 'চিকিৎসা-ভ্রমণ' নামক নৈতিক অশ্লীলতাটি, যেখানে চাকচিক্যময় ভারতীয় হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞ বা অস্থিশল্য-চিকিৎসকরা ম্যাসাজ পার্লারের পুরোদস্তুর কর্মীর মতো ভূমিকা পালন করেছেন।

জনগণের স্বাস্থ্যের অবস্থা :

এবার জনগণের স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থার কথায় আসা যাক। সেটা বলতে অবশ্য একটা গোটা বই লাগবে। তাই আমি কয়েকটা প্রতিনিধি-স্থানীয় উদাহরণের ওপর জোর দেব।

দীর্ঘমেয়াদী ক্ষুধা : জাতীয় পুষ্টি পরিমাপকারী সংস্থা জানাচ্ছে, ভারতীয়দের এক তৃতীয়াংশের দেহভর অনুপাত ১৮.৫ -- এর কম। এই তথ্যটি ভেঙে দেখলে পাওয়া যাবে, তফশিলি জাতিগুলির মধ্যে শতকরা ৬৫ ভাগের বেশি ও তফশিলি উপজাতিগুলির মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগের বেশি মানুষের দেহভর অনুপাত ১৮.৫-এর কম। সংখ্যালঘুদের মধ্যে গরিবদের অবস্থাটা জানা নেই। উৎসা পট্টনায়েক দেখিয়েছেন, মাথাপিছু খাদ্যশস্য পাওয়ার হার ১৯৯১-৯২ সালে ১৭৭ কেজি থেকে ২০০৩-০৪ সালে কমে মাত্র ১৫৩ কেজি-তে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয়দের সবচেয়ে ধনী এক-পঞ্চমাংশের সম্পদ-বৃদ্ধির কথা যেহেতু সুবিদিত ও নথিবদ্ধ সত্য, সুতরাং নীচের দিকে মানুষ নিশ্চয়ই আজ কয়েক বছর ধরে আগের চাইতে অনেক কম খেয়ে রয়েছেন এবং দীর্ঘমেয়াদী বহমান এক দুর্ভিক্ষের আরও গভীরে ক্রমশ ঢুকে যাচ্ছেন।

ব্যাপক রক্তাল্পতা, বিশেষত নারীদের মধ্যে : সামান্যতম চিকিৎসাতেই কিন্তু এই রক্তাল্পতার প্রায় সবটাই সেরে যাওয়ার মতো।

গর্ভাবস্থায় অপুষ্টি ও মাতৃ-মৃত্যুর উঁচু হার : আগে বলা কারণগুলির যোগফলে গর্ভাবস্থায় অপুষ্টির হার উঁচু হয়, যার প্রকাশ হল কম ওজনের বাচ্চার জন্ম এবং অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়ার মতো উঁচু মাতৃ-মৃত্যুর হার। ডাক্তারি কোনও হস্তক্ষেপ ওপরের দুটো কারণের যৌথ ফলকে নাকচ করতে পারে না। গর্ভাবস্থায় অপুষ্টি সারা জীবন ধরে, এমনকী, পরবর্তী প্রজন্মে বড় অসুস্থতার কারণ ঘটায়। ছোট্ট শিশুদের মৃত্যু হয় এবং ফলতঃ শিশুমৃত্যুর মোট সংখ্যার ওপরও এটা প্রভাব ফেলে।

পুষ্টি ও সংক্রমণের মধ্যে সম্পর্ক : 'জনস্বাস্থ্য-সহযোগ' -- এ আমার সহকর্মীরা দেখেছেন, এইডস বা ডায়াবেটিস-মুক্ত ফুসফুসের টিবি রোগীদের প্রায় প্রত্যেকেরই দেহভর অনুপাত ১৮.৫-এর কম। অন্য কথায়, অপুষ্টি দেহের সংক্রমণ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় হানি ঘটায় ও ফুসফুসের টিবির প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অসংখ্য সংক্রামক রোগ : ম্যালেরিয়া (যার বড় অংশ হল ক্লোরোকুইন-প্রতিরোধী ফ্যালসিপ্যারাম ম্যালেরিয়া), টিবি, শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ, কালাজ্বর ইত্যাদি অসংখ্য সংক্রামক রোগ অজস্র সংখ্যায় রয়েছে।

জঞ্জাল-সাফাইয়ের অব্যবস্থা ও পান-অযোগ্য জল সরবরাহ : এগুলো রোগ ও মৃত্যুর বড় কারণ হয়ে রয়ে গিয়েছে।

চিরাচরিত ও আমাদের জানা ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়া-ঘটিত জলবাহিত সংক্রমণগুলো তো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হিসেবেই রয়েছে, তার সঙ্গে আবার দেশের একটা বড় অংশ পানীয় জলের আর্সেনিক-দূষণের শিকার। তামিলনাড়ুর ভেলোরের সহকর্মীরা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মৃগীরোগের বৃহত্তম একক কারণ হিসেবে মস্তিষ্কের বিশেষ ধরনের কৃমি-সংক্রমণকেই খুঁজে পেয়েছেন। যেমনটা চিরকাল পড়ানো হয়েছে, সে রকম কেবল শুয়োরের মাংস-খাদকদের মধ্যেই এই কৃমি-সংক্রমণ সীমাবদ্ধ রয়েছে তা নয়, দূষিত জলে সবজি ফলানোর জন্য এটা বিশুদ্ধ নিরামিষাশীদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে।

জঘন্য স্বাস্থ্য-পরিষেবা-ব্যবস্থা ও দুর্নীতি : অবস্থাটা একটা গল্প দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। এই গল্পটা সাধারণ ভাবে সত্য। ইউরোপীয় ইউনিয়ন 'স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সংস্কার' -- এর টাকার মোটা অংশটা দেবে, তাই তার গুঁতো খেয়ে ছত্তিশগড় সরকার সরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার একটা সমীক্ষা / মূল্যায়ণ করেছিল। সেখানে জরুরি ভিত্তিতে সিজার করে বাচ্চা প্রসবের ব্যবস্থা থাকাকে স্বাস্থ্য-পরিষেবার সক্ষমতার একটা পরিমাপক হিসেবে ধরা হয়েছিল। দেখা গেল, ২৪০ লক্ষ অধিবাসীর একটি রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজ-টলেজ সব মিলিয়েও মাত্র তিনটি কেন্দ্রে এই ব্যবস্থা রয়েছে। ওষুধ কেনা ও তার বিলি-বন্দোবস্তের ক্ষেত্রেও দুর্নীতি এক বড় সমস্যা। ছত্তিশগড়ে আইনানুগ ওষুধ

তৈরির কোনও ব্যবস্থাই নেই। এখানে, মূলতঃ সরকারি ব্যবস্থায় ক্রয় ও ব্যবহারের জন্যই, জাল ওষুধ তৈরির 'শিল্প'টি অতিরিক্ত রকমের পৃষ্ঠপোষণা পায়।

সরকার-বেসরকারি অংশীদারি কোন্ পথে : ওই একই রাজ্য ছত্তিশগড়ে এসকর্ট / আয়ুস্মান হার্ট কেয়ার ও রায়পুর মেডিক্যাল কলেজে এন্ডোসার্জারি কেন্দ্র খুলতে সরকার ১২ কোটি টাকা খরচ করেছে -- দু'টোই এসকর্টস্ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনায়। বহু আড়ম্বর করে এ দু'টো খোলা হল এবং তিন বছরের মধ্যে সরকার-বেসরকারি অংশীদারিত্বের দারুণ নমুনা দেখিয়ে তারা একেবারে থেমেই গেল!

টিকা আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা: এ সবের মধ্যে কেন্দ্রের সরকার আবার আমাদের টিকা তৈরির যে ব্যবস্থা ছিল, তাকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের ব্যবস্থাটা পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত ব্যবস্থাগুলোর অন্যতম ছিল। সমগ্র মনুষ্যপ্রজাতির এক-ষষ্ঠাংশ ভারতে থাকে। এখন তারা নিজেদের টিকাকরণ কর্মসূচির জন্য আমদানি করা টিকার ওপর নির্ভরশীল।

বিকল্পের সন্ধানে : আমরা ভবিষ্যৎ কী ভাবে দেখছি, বিশেষ করে ভারতে? যে রাষ্ট্রের শ্রীঘরে আমি এখন রয়েছি, সেই রাষ্ট্রের বর্তমান সংগঠন ও সীমাবদ্ধতাগুলো থাকবেই, এমনটা যদি আমরা ধরে নিই, তা হলে কি স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা বিষয়ে পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখে গতিসঞ্চার করার কোনও সুযোগ রয়েছে? নাকি আমরা চিরকাল আলমা-আটা ঘোষণার মতো প্রশংসনীয় কিছু আচরণবিধি গ্রহণ ও তাকে অকেজো প্রমাণ করার কর্মচক্রে পাক খেতে থাকব? সম্প্রতি ছত্তিশগড়ে গড়ে তোলা মিতানিন প্রকল্পে গ্রামস্তরে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নারীকর্মী তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। জনসমাজের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার অধিকার তুলে ধরে সামগ্রিক ব্যবস্থাটির ওপরে 'চাহিদা'র দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যের অধিকার ও ব্যবস্থার জন্য এই কর্মীগোষ্ঠী আওয়াজ তুলবেন, এমনটা ভাবা গিয়েছিল। জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন 'আশা' (Accredited Rural Health Activist : ASHA) কর্মসূচির মাধ্যমে এই ধারণাটি গ্রহণ ও সম্প্রসারণ করল, কিন্তু ধারণাটি একেবারে লঘু করে দিল। আজকের 'আশা' হল পূর্বকল্পিত 'আশা'র ধারণার ধূসর ছায়ামাত্র, স্বাস্থ্য-দফতর যে কাজগুলো করতে পারছে না, সেই সব নানা ধরনের কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য বিনা-মাইনের দফতর-সহকারী।

এ সব যতই হতাশাজনক লাগুক, আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি, বিকল্প পথে হাঁটার পাথেয় হওয়ার মতো কিছু সম্পদ আমাদের রয়েছে। তাদের একটা হল জনস্বার্থ মামলা ও বিভিন্ন মানবাধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে কিছু আইন -- বিশেষ করে 'পিপ্‌ল ইউনাইটেড ফর সিভিল লিবার্টিজ' সংগঠনের 'খাদ্যের অধিকার' -- এর মামলা ও জাতীয় গ্রামীণ কর্ম-সুরক্ষা আইন ও তথ্যের অধিকার আইন নিয়ে তাদের প্রচার। দ্বিতীয় সম্পদটি হল, রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার নিয়ে চুক্তি (বিশেষ করে তার ১১ ও ১২ নম্বর ধারা, যাতে প্রত্যেকের যথাযথ ভাবে বাঁচার ও চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে) ও চুক্তি-স্বাক্ষরকারী দেশগুলিকে এই অধিকার কার্যকরী করার নির্দেশ। মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্রে, বিশেষ করে তার ২৫ নম্বর ধারা ও তার সঙ্গে ২৭ নম্বর ধারার একটি অনুচ্ছেদ পড়লে দেখা যাবে -- এ দুটি যুগ্ম ভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির যথেষ্ট ও যথাযথ স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার অধিকার এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও তার সুবিধার শরিক হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তৃতীয় সম্পদটি হল, সেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন তথা পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি, যা আমরা ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে বানিয়েছি। তাদের ক্ষমতায়নের ফারাক রয়েছে, তাদের ওপর আর্থিক দায়িত্ব ন্যস্তও করা হয়েছে অতি অল্প মাত্রায়, তবু এরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে দিয়ে জনগণ তাদের নিজেদের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার মতো অবস্থানে যেতে পারে। মোট জাতীয় আয়ের বৃহত্তর অংশ স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সেই অর্থ স্থানীয় স্তরে এই পঞ্চায়েতরাজ-ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যয় করার উপায় বের করতে হবে।

স্বাস্থ্য ও সামাজিক ক্ষেত্রে বাস্তব ও মানবিক পরিকাঠামোর অন্যান্য সম্পদের ভরকেন্দ্রটি আমাদের কাছে এখনই রয়েছে, এবং তার ওপর আমাদের আরও কিছু গঠনের কাজ করতে হবে ও সারা দেশজুড়ে তাকে জোরদার করতে হবে। সে ভাবেই সব সাধারণ ভারতীয়ের কাছে স্বাস্থ্য-পরিষেবা সত্যিই পৌঁছতে পারে। সাম্প্রতিক কালে তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশ হয়েছে, তাকে ব্যবহার করে স্বাস্থ্য ও সামাজিক ক্ষেত্রের এই পরিকাঠামোকে এতটাই শক্তপোক্ত ও উন্নত করা যেতে পারে, যা বছর দশেক আগেও ভাবাই যেত না।

'স্বাস্থ্যের অধিকার'কে কার্যকর করা

এই প্রস্তাবের খুঁটিনাটিতে আসতে গেলে বলতে হয়, আমাদের প্রস্তাব হল 'স্বাস্থ্যের ও

চিকিৎসার অধিকার’ নিয়ে একটি আইন কার্যকর করার জন্য জাতীয় স্তরে প্রচার। যেহেতু ভারতীয় সংবিধান অনুসারে স্বাস্থ্য হল একটি রাজ্যের বিষয়, তাই এটা করতে গেলে একটি ‘মডেল’ কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং তার পর রাজ্যগুলি সেটি অনুসরণ করবে। এই আইনের বিষয়গুলো এ রকম হতে পারে--

নির্ধারিত রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসার পদক্ষেপ-কাঠামো (algorithm - অ্যালগোরিদ্‌ম) - সর্বসম্মত জ্ঞানের একটি ভাণ্ডারের ওপর ভর করে চিকিৎসার সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই ‘অ্যালগোরিদ্‌ম’গুলি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বাস্থ্য-ঘটিত সমস্যার জন্য জ্ঞানভাণ্ডারের প্রয়োগকে সহজদৃশ্য করবে এবং এই ‘অ্যালগোরিদ্‌ম’গুলিকে আইনি মর্যাদা দিতে হবে। এই মর্যাদা যে কাজগুলি করবে তা হল :

১) রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসার পদ্ধতিকে যথাযথ প্রতিষ্ঠানের স্তর থেকে গোষ্ঠী-স্তরে যখন প্রথম রোগী দেখা হচ্ছে, তত দূর পর্যন্ত, অন্তত মধ্যস্তরের চিকিৎসা পর্যন্ত, প্রমিত (অর্থাৎ নির্দিষ্ট মানোপযোগী) করা যেতে পারে। (এই ‘অ্যালগোরিদ্‌ম’ গুলি ইংরেজি ও বিভিন্ন দেশি ভাষায় পাওয়ার এবং ইন্টারনেটে পাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে)।

২) চিকিৎসা শুরুর প্রথম স্তরেই এই নির্ধারিত অ্যালগোরিদ্‌ম ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় স্বত্বাধিকার কতটা, তা প্রকাশ্যে আনবে আর তার সঙ্গে সঙ্গে স্বত্বাধিকার-ভঙ্গের প্রতিবিধানের পদ্ধতিটিও বলবে।

৩) **চিকিৎসার নথিভুক্তি** : কমপিউটারে রক্ষিত ও রোগীর কাছে থাকা কাগজে সমস্ত কাজের বিবরণ ও রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর চিকিৎসার নথি রাখা থাকবে। অধিকারের ওপর ভিত্তি করে গড়া কোনও ব্যবস্থায় স্বত্বাধিকার কতটা রক্ষিত হল, বা বিপরীত ভাবে, কতটা ভাঙা হল, তার নথিভুক্তিকরণের পদ্ধতি রাখতে হয়। নির্ধারিত অ্যালগোরিদ্‌মটি এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্তরে কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে এবং ব্যবস্থাটির মূল্যায়ণ ও সামাজিক হিসাব-পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পটভূমিকা সরবরাহ করবে। আর নথিভুক্তির সহজ সুবিধা স্বাস্থ্য-পরিষেবার বিভিন্ন স্তরে রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসার মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পরস্পরকে সংযুক্ত করা। এটা তো রয়েছেই, অথচ, আজকের সবচেয়ে প্রযুক্তি-উন্নত ব্যবস্থাতেও এটা পাওয়া যায় না।

স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত পেশাদারদের ও প্রতিষ্ঠানগুলির সার্টিফিকেট প্রদান :

যে সব ব্যক্তির পেশাদার হিসেবে প্র্যাকটিস করার জন্য সার্টিফিকেট লাগে, আর যে সব প্রতিষ্ঠান (সরকারি বা বেসরকারি, বা এ দুইয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় গড়া) স্বাস্থ্য-পরিষেবা দেওয়ার কাজ করবে, তাদের জন্য এই ব্যবস্থা ভাবা যেতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থায় মাপকাঠি হিসেবে দক্ষতা, জ্ঞান, ও কতটা কাজ করল, তা নিরূপণের ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারটি রাখা যেতে পারে -- যেমন নগদ অর্থ ছাড়া কোন্ স্তরের কত রোগী দেখেছে বা একজন অর্থপ্রদানকারীর (যথা সরকার, বা ব্যক্তিগত ভাবে, বা ইনসিওরেন্স কোম্পানি দ্বারা) মাধ্যমে আসা কোন্ স্তরের কত রোগী দেখেছে। মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স ব্যবস্থা যখন বড় আকারে আসবে, তখন তারও সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হবে। ভর্তুকিপ্রাপ্ত ইনসিওরেন্স ব্যবস্থা এ ভাবে সব অসুস্থ মানুষের কাছে স্বাস্থ্য--পরিষেবা সম ভাবে পৌঁছে দিতে পারে।

স্বাস্থ্যের অন্যান্য পূর্বশর্ত : খাদ্য, স্বাস্থ্য-পরিষেবা, স্বাস্থ্য-সুবিধা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের অন্যান্য পূর্বশর্তগুলি সকলের কাছে পৌঁছনো ও স্বত্বাধিকার হিসেবে সুনিশ্চিত করা। ‘পিপ্‌ল ইউনাইটেড ফর সিভিল লিবার্টিজ’ সংগঠনের ‘খাদ্যের অধিকার’ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কিছু নির্দেশ বিভিন্ন সময়ে দিয়েছে। সেগুলি অন্য ক্ষেত্রে, যেখানে এমন নির্দেশাবলী নেই, সেখানেও ‘মডেল’ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। পল ফ্রেমার যেমন বলেছেন, রাষ্ট্রের নির্দেশকে অধিকারের গ্যারান্টি হিসেবে ধরা দরকার:

‘‘এটা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে যে, নাগরিকদের স্বাধীনতা, বাইরের সদিচ্ছাপূর্ণ কাউকে দিয়ে নয়, তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলি দিয়েই বেশি ভালো,ভাবে রক্ষা করা সম্ভব। রাষ্ট্রের ব্যর্থতা এন.জি.ও.-দের মানবাধিকার-রক্ষা কর্মসূচি দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়।’’ (এম. ইগনাতিএফ, ২০০১, পল ফ্রেমার--এর পূর্ব-উদ্ধৃত গ্রন্থ, ২০০৩)

(ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ২২ নভেম্বর ২০০৮ সংখ্যায় ইংরেজি ভাষায় প্রথম প্রকাশিত, লেখকের অনুমতিক্রমে অনূদিত। অনুবাদ করেছেন জয়ন্ত দাস ও সুব্রত পাল।)

রাহুল

শ্রীলা দত্ত

রাহুল এখন সোফায় বসে মন দিয়ে বই পড়ছে। তার অনেকটাই বুঝছে না, তবু পড়ে যাচ্ছে। কারণ, গল্পটা ওর জানা, ও সিনেমাটা দেখেছে, তাই অনেক ঘটনা ওর চেনা। এখন গরমের ছুটি। ওর সকালের কাজ হয়ে গিয়েছে, মায়ের দেওয়া অংক আর ইংরিজি। কাজেই, এখন ও যা ইচ্ছে করতে পারে। তাই নতুন পাওয়া বই নিয়ে বসেছে। রাহুল কমপিউটারে নানা রকম খেলা খেলতেও ভালোবাসে। ছুটির খানিকটা সময় ওর তাই নিয়ে কাটে। এ ছাড়া ভালোবাসে দিদির সঙ্গে ভিডিও দেখতে আর বাড়ির বাইরে সাইকেল চালাতে। এ বছর সাইকেল নিয়ে বেরনো হয়নি। রাহুল দিদির সঙ্গে যেতে চায় আর দিদি নানা কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত। অনেক দিক থেকে রাহুল যে কোনও এগারো বছরের ছেলের মতো। ওর আজকের দিনটাও কাটছে ওর বয়েসি অন্য যে কোনও ছেলের মত। কিন্তু রাহুল অন্য সব ছেলেদের মতো নয়। আর ওর সব দিন এক রকম কাটেও না।

প্রথমতঃ, ওর কোনও বন্ধু নেই, অন্ততঃ সমবয়েসি কেউ নয়। যদিও রাহুল লোকজন ভালোবাসে, কেউ বাড়িতে এলে খুব খুশি হয়, ও জানে না কী করে অন্যদের সঙ্গে মিশতে হয়। ও অনেক দেরি করে কথা বলতে শিখেছে। এখনও ওর কথায় আড়ষ্টতা রয়েছে। যারা ওকে ভালো করে চেনে না, তারা অনেক সময় ওর কথা বুঝতে পারে না। কথা বলতে গিয়ে একতরফা নিজের কথাই বলে যায়, অন্য জন শুনছে কি না, তা-ও খেয়াল করে না। ঠাট্টা বোঝে না। খেলায় যোগ দিতে গিয়ে খেলার নিয়ম বুঝতে পারে না, কে কী করছে বা ভাবছে বুঝতে পারে না, খেলা ভন্ডুল করে দেয়। দুঃখের কোনও ঘটনার কথা শুনে জোরে হেসে ওঠে। খুব মজা করছে ভেবে উলটো-পালটা কথা বলে। লোকে যে বিরক্ত হচ্ছে বা রাগ করছে, সেটা বোঝার ক্ষমতা ওর নেই। তারা যখন বকে, ধমকে, জোর করে বুঝিয়ে দেয়, তখন ও খুব দুঃখ পায়। যে ছেলেটা দিব্যি অংকের হিসাব করতে পারে, সে কিছুতেই এই সহজ হিসাবটা ধরতে পারে না যে, ওর নিজের ব্যবহারই ওর দুঃখের কারণ। অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করতে না-পারা রাহুলের একমাত্র সমস্যা নয়। ওর নিজের মনের ভেতরেও নানা রকম চিন্তা কখনও কখনও জট পাকিয়ে যায়। অন্যের কথা ও অনেক সময় ভুল বুঝে খুব ভয় পেয়ে যায়। বাবা যদি বলেন "রাহুল, তুমি এখন বড় হয়েছ। এই রকম ছোট বাচ্চার মতো বোকা বোকা কথা বলে হাসছ কেন?" রাহুল ভাবে, বাবা এটা বললেন বলে ও হয়তো সত্যিই ছোট হয়ে যাবে। মা যদি বলেন, "তোমাকে আজ খাবারটা একটু পরে দিচ্ছি", রাহুল হঠাৎ ভেবে বসে, ও খেতে না-পেয়ে মরেই যাবে। এই সব দুশ্চিন্তার জালে জড়িয়ে গিয়ে ও এক-একদিন খুব চিৎকার চেঁচামেচি, মারামারি করে ফেলে। কেমন হিংস্র হয়ে ওঠে। পরে ওর খুব খারাপ লাগে। কিন্তু, তখন নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। আর এক রকম জিনিস রাহুলকে দিশাহারা করে ফেলে। ও চায় জীবনের সব কিছু একটা বাঁধাধরা ছকে চলবে, রোজকার

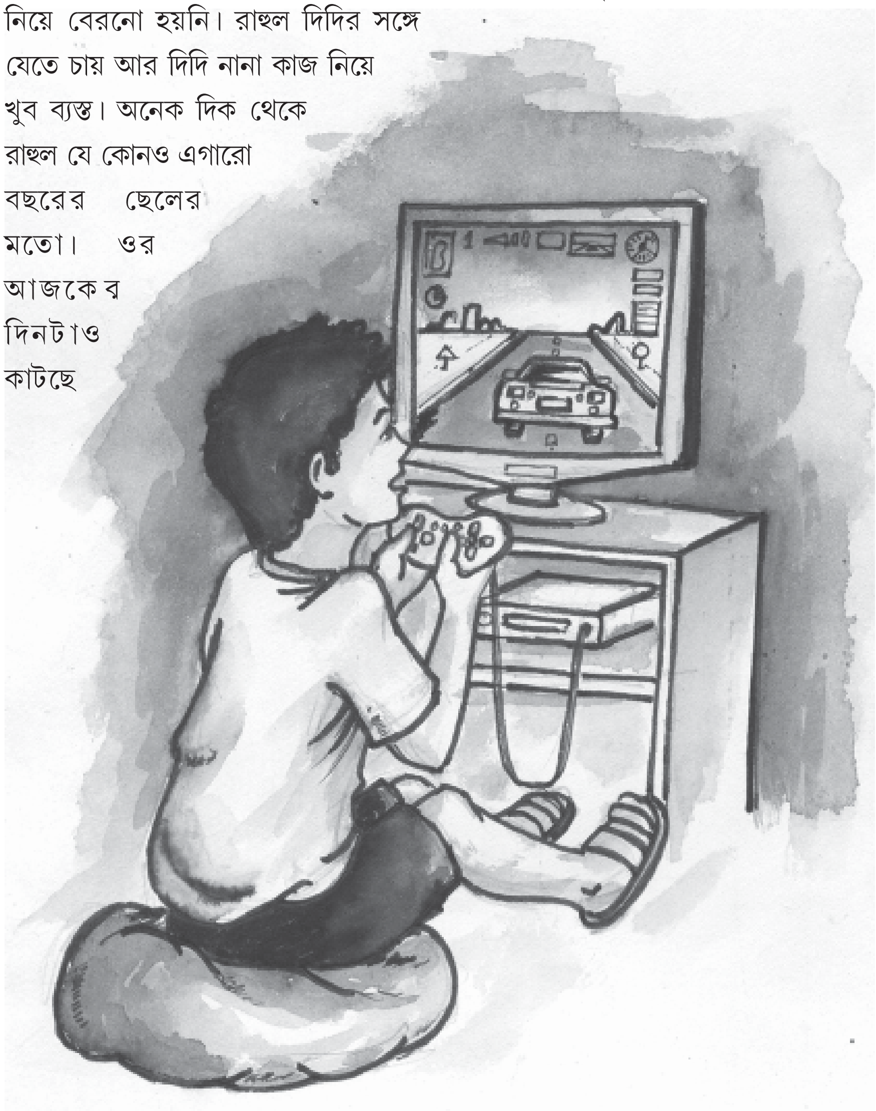

রুটিন ওর আগে থেকে জানা থাকবে, হঠাৎ করে নতুন কিছু ঘটবে না। কিন্তু জগৎ রাহুলের হিসাব মতো চলে না, কাজেই ওকে পদে পদে ধাক্কা খেতে হয়। ওর পছন্দের কোনও লোকও যদি খবর না-দিয়ে হঠাৎ এসে পড়ে, রাহুল পুরোপুরি খুশি হতে পারে না। নিয়মের বাইরের ঘটনাটা মেনে নিতে একটু সময় লাগে।

রাহুলের এই সব মানসিক আর ব্যবহারিক প্রতিবন্ধকতার কারণ ওর অটিজম। এটা এক ধরনের স্নায়ুবিকাশের (neurodevelopmental) অসুখ। তার মানে, জন্মের আগের থেকে এর সূচনা আর মস্তিষ্ক-গঠনের প্রক্রিয়ায় কোথাও গোলযোগ এর মূল কারণ। নানা রকম পরীক্ষা (imaging experiment) করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, অটিস্টিক মানুষের মস্তিষ্ক স্বাভাবিক মস্তিষ্কের থেকে নানা ভাবে আলাদা। কিন্তু এই তফাৎগুলোর সঠিক অর্থ কী, তা বুঝতে গেলে আরও অনেক গবেষণা দরকার। আর এই জ্ঞান কোনও দিন চিকিৎসায় লাগানো যাবে কি না, তা এখনও অজানা। অটিজম কেন হয়, তা-ও কেউ এখনও সঠিক ভাবে বলতে পারেনি। শুধু এই টুকুই আমরা জানি যে, মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় ছেলেরা এর শিকার হয়, আর যে কোনও শিশুর অটিস্টিক হওয়ার সম্ভাবনা অন্ততঃ খানিকটা বংশগত।

অটিজমের প্রকাশও নানাবিধ। কোনও কোনও ছেলেমেয়ে সারা জীবনেও কথা বলতে শেখে না। তাদের আচরণ বেশ অস্বাভাবিক থেকে যায়, অন্যের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। কেউ কেউ বড় হতে হতে অনেকটা উন্নতি করে, প্রায় স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সকলের মধ্যে অটিজমের সব লক্ষণ দেখা যায় না। সাংঘাতিক প্রতিবন্ধী থেকে শুরু করে প্রায় স্বাভাবিক মানুষ এই অসুখের আওতায় পড়ে বলে একে আজকাল বলা হয় অটিজম স্পেকট্রাম ডিস্‌অর্ডার (Autism Spectrum Disorder-ASD)। এটা কিন্তু জোর করে সবাইকে ধরে-বেঁধে এক দলে ফেলা নয়। সব অটিস্টিক মানুষের মৌলিক কয়েকটি জায়গায় অক্ষমতা রয়েছে--- কথাবার্তা বলা বা ভাব-আদানপ্রদানে, সামাজিক ব্যবহারে, আর খুব সীমিত গণ্ডির মধ্যে নিজের মনযোগ ধরে রাখা— যেমন খেলনা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটানো।

অটিজমের কোনও চিকিৎসা নেই ঠিকই, কিন্তু দেখা গিয়েছে যে, শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতিতে শেখালে অটিস্টিক বাচ্চারা বড় বয়স পর্যন্ত অনেক উন্নতি করতে পারে। এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যে ধারণায়, তাকে বলে নিউরোপ্লাস্টিসিটি (neuroplasticity) । বিজ্ঞানীরা আগে বিশ্বাস করতেন যে, ছোট বয়সের পর মানুষের মস্তিষ্কের আর কোনও পরিবর্তন হয় না। এই ধারণা এখন আমূল পালটে গিয়েছে। ঠিক মতো থেরাপি দিতে পারলে, একজন অটিস্টিক বাচ্চার কতটা উন্নতি হওয়া সম্ভব, সেই প্রসঙ্গে ডা. গ্রিনস্প্যান লিখেছেন : ‘‘আমরা যদি ১২ বছর বয়সের একটা ছেলে, যার আচরণ ৪ বছরের মতো, তাকে নিয়ে কাজ শুরু করি, হয়তো ১৬ বছর বয়সে সে ৬ বছরের মতো হবে। এর মানে সে অনেকটাই উন্নতি করবে। যদি ২২ বছর বয়সে যে ১০ বছরের মতো হয়, সে খানিকটা আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে। ৩০ বছর বয়সে যদি যে ১৫ বছর বয়েসির মতো ব্যবহার করে, তা হলে সে কলেজে পড়তে পারবে, তার বান্ধবী থাকতে পারে, সে চাকরি পেতে পারে, সুন্দর জীবনযাপন করতে পারে। এটা কি সম্ভব? আমরা এখনও ঠিক জানি না। এই পরীক্ষা এখনও হয়নি। তবে এটুকু আমরা জানি যে, মানুষের মস্তিষ্ক আর স্নায়ুতন্ত্র আগে যা ভাবা হত, তার তুলনায় অনেক বেশি নমনীয়। আমরা এখন অনেক ছেলেমেয়ে দেখছি, যারা বড় বয়সে নতুন জিনিস শিখছে --- আগে মনে করা হত যে এটা কোনওমতেই সম্ভব নয়’’। এই ক্রমশ উন্নতির সম্ভাবনা যে কোনও শিশুর ক্ষেত্রে সত্যি, সে যতই অক্ষম হোক।

রাহুলের বড় হয়ে ওঠা

রাহুলের প্রায় দু’বছর বয়স পর্যন্ত ওকে নিয়ে আমাদের কোনও চিন্তা হয়নি। ও একটু দেরিতে হাঁটতে শিখেছিল, কিন্তু আর বাচ্চার মতো হাসত, খেলনা নিয়ে খেলত, গান আর ছড়া শুনতে ভালোবাসত, কোলে উঠে গলা জড়িয়ে থাকতে ভালবাসত। এক দেড় বছর বয়সের মধ্যে অল্প কয়েকটা কথাও বলতে শিখেছিল। সেই সময় ওকে নিয়ে কয়েক মাস কলকাতায় গিয়েছিলাম। কলকাতা থেকে ফিরে ও রোজ রাত্রে ঘুম থেকে উঠে খুব কাঁদত, অনেক চেষ্টা করেও ওকে থামানো যেত না। ওর যখন প্রায় দু’বছর বয়স, রোজ সকালে একটা স্কুলে যেতে শুরু করল। তখনই হঠাৎ কথা বন্ধ করে ফেলল। আমরা আমেরিকায় থাকি, স্কুলে সবাই শুধু ইংরেজি বলে। আমরা ভাবলাম, রাহুল ছোটবেলা থেকে বাড়িতে খালি বাংলা শুনছে, হঠাৎ নতুন ভাষা শুনে বুঝতে পারছে না কী করবে। কয়েক মাস পর যখন আবার একটা একটা করে কথা বলতে শুরু করল, আমরা

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। সবাই বলল, ছেলেরা দেরিতে কথা বলে, ও তো এখনও ছোট আছে, ঠিক শিখে যাবে।

রাহুল তিন বছরের কাছাকাছি পৌঁছতে পৌঁছতে স্পষ্ট হয়ে উঠল, ও অন্য বাচ্চাদের মতো নয়। দুই থেকে তিনের মধ্যে কোনও এক সময় বেশির ভাগ বাচ্চার কথার বিস্ফোরণ ঘটে। রাহুল কিন্তু অল্প কয়েকটা কথার মধ্যেই আটকে থাকল। এই বয়সে বাচ্চাদের প্রথম অক্ষর পরিচয় হয়, তারা লাল, নীল, সবুজ নানা রং চিনতে শেখে। রাহুলকে আমরা কোনওটাই শেখাতে পারলাম না। সবচেয়ে চিন্তার বিষয়, রাহুল আমাদের কথায় সাড়া দিত না। কানে ঠিকই শুনতে পেত, কোথাও বেড়াতে যাওয়া নিয়ে কথা বললে জুতো পরে নিত, দিদির কাছে চকোলেট রয়েছে জানতে পারলে, না-ডাকতেই ছুটে চলে আসত। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিত না। একটা জিনিস রাহুল ভালো পারত, জন্তু জানোয়ারের ছবি দেখে নাম বলা। এই পারাটাকে মনে মনে আঁকড়ে ধরে ভাবতাম, জিরাফ যখন আকার দেখে চিনতে পারছে, কোনও না কোনও সময় ABCD-ও চিনতে পারবে নিশ্চয়ই। রাহুলের স্কুলের ডিরেক্টর যখন একদিন আমাদের ডেকে পাঠিয়ে বললেন যে, ও কিছু শিখছে না, অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে মিলেমিশে খেলতে পারছে না, তিন বছর বয়সে ওর আচরণ দু'বছরের মতোই থেকে গিয়েছে, আমরা একটুও অবাক হলাম না। মনে হল, একদিক থেকে ভালোই হয়েছে, ভেতর ভেতর কুরে খাওয়া চিন্তাটা একজন খোলাখুলি প্রকাশ করেছেন, এই বার হয়ত ডাক্তার দেখিয়ে এর চিকিৎসা করা যাবে।

তখনই আমদের সবচেয়ে বড় আশাভঙ্গ হল। আমাদের সমস্যা খুব সহজে সমাধান হয়ে যাবে, এটা আমরা ভাবিনি। তবে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যুগে উন্নত দেশে থেকে ভেবেছিলাম, ডাক্তার দেখালে আমরা অন্ততঃ পথের সন্ধান পাবো। বিশেষজ্ঞ স্নায়ু-মনোবিদ দরকার মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলে দেবেন রাহুলের সমস্যা ঠিক কী, কোন্ দিকে এগোতে হবে, কী রকম চিকিৎসা করলে কী ধরনের ফল পাওয়ার সম্ভাবনা, রাহুল ভবিষ্যতে কী রকম উন্নতি করতে পারবে

ইত্যাদি। কিন্তু কয়েকজন ডাক্তার, থেরাপিস্টের দরজায় ঘুরে উপলব্ধি করলাম যে, বিশেষজ্ঞরা অনেক পরামর্শ দেন ঠিকই, কিন্তু এই ধরনের সমস্যা সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে কেউ কিছু জানেন না! প্রত্যেকেই একটা ছোট অংশ নিয়ে কথা বলেন -- স্পিচ প্যাথোলজিস্ট বলেন ওকে কথা বলানোর জন্য থেরাপি করাতে, স্নায়ুবিদ এম.আর.আই, ই.ই.জি., ই.এম.জি ইত্যাদি করে জানান, কিছু পাওয়া যায়নি। স্কুলের মনোবিদ বলেন ওকে "childhood developmental delay" (শৈশব-বিকাশে বিলম্ব) লেবেল দিয়ে ওদের প্রি-স্কুলের যে আলাদা ক্লাস রয়েছে, তাতে ভর্তি করে নেবেন। স্নায়ুবিদ আর developmental pediatrician (শিশু-বিকাশে বিশেষজ্ঞ) দু'জনেই একমত যে, রাহুল অটিস্টিক নয়, কারণ ও বেশি কথা বলতে না-পারলেও, মুখের দিকে তাকায়, হাসে, মেলামেশা করার আগ্রহ দেখায়। তাই রাহুল আপাততঃ ডায়াগনোসিস পায় "Language delay" (ভাষাশিক্ষায় বিলম্ব)। (পরে জানতে পারি, অটিস্টিক হলেই একটা শিশু পুরোপুরি অসামাজিক হবে, তেমন কোনও কথা নেই। কিন্তু তখন, ২০০৩ সালে, এই দু'জন ডাক্তার দৃশ্যত সেটা জানতেন না)। পুরো সমস্যাটাকে সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখার কেউ নেই। রাহুলকে কোন্ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব, কী থেরাপি করাব, তা ঠিক করার দায়িত্ব পুরোপুরি আমাদের। স্পিচ থেরাপি ছাড়াও রয়েছে অকুপেশনাল থেরাপি, মিউজিক থেরাপি, আরও অন্যান্য অনেক কিছু। সব গুলোই প্রচণ্ড ব্যয়সাধ্য। কোনওটা ডাক্তার অনুমোদিত, কোনওটা নয়। একটার সঙ্গে অন্যটার কোনও যোগ নেই। আমার ছেলের কোন্ থেরাপি প্রয়োজন, সেটা বলে দেওয়ার কেউ নেই। আমার কতটা খরচ করার ক্ষমতা, চারদিকে ছেলেকে সঙ্গে করে ছুটে বেড়ানোর সময় কতটা, তাই দিয়ে বিচার করে নিজেকেই ঠিক করতে হবে চিকিৎসার পদ্ধতি। এই বিশৃঙ্খলার কারণ বিজ্ঞানের জগতে শিশু-বিকাশের সমস্যা সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা। একবিংশ শতাব্দীতে এটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। বর্তমানে এই নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে কিন্তু এই গবেষণা চিকিৎসায় রূপান্তরিত হতে অনেক বছর লেগে যাবে। তত দিন পর্যন্ত আমাদের একমাত্র উপায়, বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক নানা রকম থেরাপির জঙ্গলে নিজে পথ কেটে রাস্তা খুঁজে নেওয়া। অটিজমের কোনো বায়োলজিক্যাল মার্কার জানা নেই, আচরণ-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী (behavioural question-

naire)-র মাধ্যমে, বাবা-মা স্কুলের টিচার সবাইকে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশ্ন করে এখনও পর্যন্ত এর রোগ-নির্ণয় হয়। মনোবিদ্‌দের তৈরি এই প্রশ্নাবলী এখন অনেক পরিশীলিত হয়েছে, কিন্তু তা কখনও সুনিশ্চিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিকল্প হতে পারে না। আজও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কাছে একজন অটিস্টিক ব্যক্তি শুধু পেতে পারে কয়েকটা বাহ্যিক মানসিক সমস্যার জন্য ওষুধ, আর কিছু নয়।

সাড়ে তিন বছর বয়সে রাহুলকে আমরা সেই বিশেষ প্রি-স্কুলে ভর্তি করলাম, আর শুরু হল স্পিচ থেরাপি। অল্প দিন মিউজিক থেরাপি আর অকুপেশনাল থেরাপি-ও করা হয়েছিল, তবে সেই সময় ওর মূল সমস্যা কথা বলায় ছিল বলে আমরা স্পিচ থেরাপি-র ওপরই জোর দিয়েছিলাম। ওকে কোনও ওষুধ দেওয়া হয়নি। কিন্তু মাঝে মাঝে মাছের তেলের ক্যাপসুল দিতাম। রাহুলের ধীরে ধীরে উন্নতি হতে লাগল। প্রথম দিকে স্কুল থেকে রোজ নালিশ শুনতাম, রাহুল অন্য বাচ্চাদের মেরেছে বা কামড়ে দিয়েছে। এটা আস্তে আস্তে কমল। ও একটু একটু করে অক্ষর, রং সবই চিনল। কথা বলায় ও সমবয়েসিদের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে থাকল, তবু নিজের গতিতে এগিয়ে চলল। হঠাৎ কোনও কারণে উত্তেজিত হয়ে যাওয়া, রেগে গিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার-চেঁচামেচি করার প্রবণতা ওর থেকে গেল।

রাহুলের যখন প্রায় ছ' বছর বয়স, আমরা ভাবলাম ওকে ভালো করে আর একবার পরীক্ষা করানো হোক। তখনও আমাদের মনে আশা ছিল, ঠিক মতো চিকিৎসা আর সাহায্য পেলে রাহুল ওর সব সমস্যা অতিক্রম করে স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। এবার আমরা গেলাম মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমাদের কাছাকাছির মধ্যে সবচেয়ে বড় গবেষণাকেন্দ্রে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিভাগে মূল্যায়ণ করা হয়। আমরা যেখানে পৌঁছলাম, পরে বুঝলাম, সেটা ভুল জায়গা ছিল। সেখানে আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছিল খুবই দুঃখের। খুব অল্প কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মনস্তত্ত্বের গবেষক আমাদের পরিষ্কার বলে দিলেন, রাহুল অটিস্টিক নয়, ওর রয়েছে 'মৃদু মানস-মন্দন' (mild mental retardation) এবং ওর জন্য কোনও থেরাপি নেই। ওর মানসিক বয়স দশ-এগারোর বেশি কখনওই এগোবে না। ওকে ভালো করার চেষ্টা করতে গিয়ে আমাদের নিজেদের মাথা খারাপ না-করাই উচিত। আমার নিজের জানা কয়েকটা থেরাপির কথা জিজ্ঞাসা করলাম, প্লে-থেরাপি (play therapy) কিংবা অ্যাপ্লায়েড বিহেভিয়রাল অ্যানালিসিস (Applied Behavioural Analysis-ABA)। উনি খুব জোর দিয়ে বললেন, এই সব থেরাপি অটিস্টিক বাচ্চাদের জন্য, রাহুলের জন্য নয়। এটা যে খুব ভুল কথা তখনই বুঝেছিলাম। প্লে -থেরাপির উদ্ভাবক স্ট্যানলি গ্রিনস্প্যান ওঁর বইতে পরিষ্কার বলেছেন, এই থেরাপি সব রকম বিকাশজনিত সমস্যার জন্য। তা ছাড়া এখন কোনও বিজ্ঞানী মনে করেন না যে কারও মানসিক ক্ষমতা স্থিতিশীল। 'মানস-মন্দন' সারানো যায় না ঠিকই, কিন্তু ঠিক মতো শিক্ষা দিলে, যে কোনও শিশুর খানিকটা উন্নতি হবেই।

এই অভিজ্ঞতার পর আমাদের বিশেষজ্ঞ-ডাক্তার-মনোবিদদের ওপর সব রকম ভরসা চলে গেল। মনে হল, এত দিন পর্যন্ত আমরা সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি সাধারণ মানুষের কাছেই, স্কুলের টিচার বা বন্ধু, যারা ধৈর্য ধরে, আদর করে রাহুলের সঙ্গে সময় কাটিয়েছে। সেই সময় প্রথম শ্রেণিতে রাহুল মিসেস স্মিথ নামে একজন অসাধারণ টিচার পেয়েছিল। তার আগে পর্যন্ত স্কুলে ওর সঙ্গে সব সময় বড় কেউ একজন সাহায্য করার জন্য থাকতেন। মিসেস স্মিথ প্রথম দিনই রাহুলের সাহায্যকারী মহিলাকে বলেছিলেন ''তোমার ওর সঙ্গে আসার দরকার নেই। ও নিজেই ক্লাসে কাজ করতে পারবে, আমি ওকে দেখাব।'' সেই বছর রাহুল যতটা উন্নতি করেছিল, তার আগে বা পরে কখনও করেনি। ও পড়তে শিখল, লিখতে শিখল, অঙ্ক শিখল, ওর মারামারি আর রেগে গিয়ে চিৎকার করার প্রবণতাও অনেক কমে গেল। দুঃখের বিষয়, এর পর আমরা আর কোনও মিসেস স্মিথ পাইনি। আমরা নিজেরাও মিসেস স্মিথ হতে পারিনি। তবে মিসেস স্মিথের দৃষ্টান্ত সব সময় মনে রাখার চেষ্টা করি। আর সেই বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে (এবং স্ট্যানলি গ্রিনস্প্যানের প্লে থেরাপি-র ভিত্তি এই ভাবনার ওপরই) যে, আমাদের বাচ্চাদের কাছে আমাদের ধৈর্য, নিঃশর্ত ভালোবাসা, মনযোগ আর তাদের ভাবনা বা অনুভূতিকে মর্যাদা দেওয়ার মূল্য অপরিসীম। এটা সব ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রেই সত্যি। তবে যার অটিজম বা এই রকম কোনও সমস্যা আছে, তার কাছে এটা জীবনদায়ক।

রাহুল যখন মিসেস স্মিথের আওতা থেকে বেরিয়ে ক্লাস টু-তে উঠল, তখন সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। নতুন টিচার, এই ক্লাসে অনেক বেশি ছাত্র, রাহুল ক্লাসে চিৎকার করে, অন্য বাচ্চাদের বা টিচারকে মারে, দৌড়ে বেরিয়ে যায়। এই ক্লাসে অন্য কিছু ছাত্র রাহুলের পেছনে লাগত, টিচার সেটা খেয়াল করতেন না। আগের বছর মিসেস স্মিথের সঙ্গে যখন দেখা করতে যেতাম, উনি রাহুলের সঙ্গেই কথা বলতেন। বলতেন, ''রাহুল তোমার বাবা-মাকে দেখাও, তুমি স্কুলে কী করেছ।'' নতুন টিচারের সঙ্গে যখন দেখা করতে গেলাম, রাহুল একপাশে চুপচাপ বসে থাকল, উনি এমন ভাবে কথা বলে গেলেন, যেন রাহুল ঘরেই নেই। পুরো বছরটা রাহুলের খুব

খারাপ কাটল। পরের বছরের শুরুতে আর এক নতুন টিচারের সঙ্গে যখন আবার গন্ডগোল শুরু হল, আমি রাহুলকে স্কুল থেকে বের করে নিলাম। এদেশে অনেকেই নানা কারণে ছেলেমেয়েকে স্কুলে না-পাঠিয়ে বাড়িতে পড়ায়, আমিও স্থির করলাম তাই করব। রাহুলকে দেখাশোনা করার জন্য আগেই চাকরি ছেড়েছিলাম, বাড়িতে অল্প কিছু লেখার কাজ করতাম। কাজেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হল।

রাহুলকে তিন বছর বাড়িতে পড়ালাম। যাতে অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খানিকটা মেলামেশা করার সুযোগ পায়, সে জন্য ওকে কয়েকটা খেলার ক্লাসে ভর্তি করলাম। বাড়িতে পড়ানো সব সময় সহজ ছিল না। রাহুল পড়ায় মন দিতে চাইত না, আমার পক্ষেও ধৈর্য রাখা কঠিন হয়ে উঠত। তাই দ্বিতীয় বছর আমাদের বন্ধুরা ওকে সপ্তাহে একদিন করে ওঁদের বাড়িতে রেখে পড়াতেন। তৃতীয় বছর রাহুল স্কুলে একটু সময়ের জন্য যেতে শুরু করল, শুধু গান আর খেলার ক্লাসের জন্য। সেই বছর ওকে আর একটা জায়গাতেও সপ্তাহে একদিন করে নিয়ে যেতাম, সেখানে যে সব বাচ্চারা বাড়িতে পড়াশোনা করে, তাদের বাবা-মায়েরা একসঙ্গে কিছু ক্লাস করাতেন। বাড়িতে পড়ে রাহুল যতটা এগিয়ে যাবে ভেবেছিলাম, ততটা হয়নি। রাহুলকে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মেন্টালি রিটার্ডেড বলা সত্ত্বেও আমরা খেয়াল করেছিলাম, ও অংক ভালোই বোঝে, আর ভাষার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও, ওর শেখার ক্ষমতা যথেষ্ট রয়েছে। ওর শেখার পথে বড় বাধা হয়ে উঠল মনযোগের অভাব। পড়তে বসলেই উলটো-পালটা কোনও কথা বলে হাসতে শুরু করত কিংবা কিছু একটা নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করত। ও বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সমস্যাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ওর রাগ করে চেঁচামেচি, মারামারি করার প্রবণতা বেড়েই চলল। যখন মাথা ঠাণ্ডা হত, ও নিজেই বুঝত যে, ও যা করেছে, সেটা ঠিক নয়। তখন সেটা নিয়ে এত ভালো করে কথা বলত, মনে হত, আর একটু চেষ্টা করলেই ওকে শেখানো যাবে কি করে

নিজেকে সংযত রাখতে হয়। কিন্তু আবার মাথা গরম হলে সে সব কথা ভুলে যেত। রাহুলের বাবা বলতে লাগল, রাহুলকে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাওয়ানো উচিত। আমার সেটা একেবারেই পছন্দ ছিল না। মনে হত, তা হলে ও ওষুধের উপর সারা জীবন নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, আর নিজেকে সংযত রাখতে শিখবে না। এটা নিয়ে কিছু দিন আমদের মধ্যে বেশ মনোমালিন্য হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আমাদের কয়েকজন বন্ধু মিলে আমাকে বোঝালেন, ওষুধ দিতে না-চাইলেও, ডাক্তার দেখাতে ক্ষতি নেই। অনেক বছর আমরা কোনও ডাক্তারের কাছে যাইনি, নতুন কিছু চিকিৎসা বেরিয়েছে কি না, তা-ও জানা যাবে।

রাহুলের যখন দশ বছর বয়স, আমরা আবার গেলাম মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবার আগে থেকে ভালো করে অনেকের কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে সবাই যাকে ভালো বলল, সেই ডাক্তারের কাছে গেলাম। মনরোগবিদ ডা. গাজীউদ্দিন। ওঁর অটিজম স্পেক্ট্রাম ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন শুধু মনরোগবিদ নন, স্পিচ-প্যাথোলজিস্ট, সাইকোথেরাপিস্ট আর নিউরো-সাইকোলজিস্ট। এবার আমরা প্রথমে যা চাইছিলাম, তা পেলাম -- একটা জায়গা, যেখানে বিভিন্ন ধরনের বিশেষজ্ঞ একসঙ্গে রাহুলকে দেখে আমাদের গাইড করতে পারেন। আমরা একদিন সারাদিন ওখানে বসে নানা রকম প্রশ্নমালা ভরলাম, রাহুলকে অনেকে আলাদা করে দেখলেন। দিনের শেষে ডায়াগনোসিস পাওয়া গেল --- অটিজম। ডা. গাজীউদ্দিন খুব জোর দিয়ে বললেন স্কুলে ফেরত পাঠাতে। তাই রাহুল গত এক বছর স্কুলে যাচ্ছে, সপ্তাহে একদিন ওই ক্লিনিকে ওর বিহেভিয়ার থেরাপি চলছে, স্কুলে স্পিচ থেরাপি হয়।

রাহুলের স্কুলে ফেরা মোটেই সহজ হয়নি। ওকে ওরা প্রথমে সাধারণ ক্লাসে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওখানে ও অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছিল না, আর টিচারের কথা শুনছিল না বলে ওকে স্পেশাল ক্লাসে দেওয়া হল। সেখানে বলাবাহুল্য পড়াশোনা খুব বেশি হয় না। সেখানে ও যে খুব ভালো ছিল, তা নয়। বহু বার ওরা ওকে বাড়ি ফেরত পাঠিয়েছে, কারণ ও টিচারকে শাসিয়েছে, বা কোনও ছাত্রকে মেরেছে বা সব জামাকাপড় খুলে ফেলেছে। এখানে বলা দরকার, স্কুলের বাইরে কিন্তু রাহুল গত এক বছর অনেক ভালো আছে। বিশেষ করে অন্য কারও বাড়ি গেলে

কথা শোনে, নিজেকে সংযত রাখে। স্কুলে কেন সেটা করতে পারছিল না, ঠিক জানি না। একটা কারণ হতে পারে যে, অটিস্টিক ছেলেমেয়েদের অনেক সময় ইন্দ্রিয় বেশি সংবেদনশীল হয়। বেশি লোকজন, আলো, আওয়াজ ওদের পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়।

রাহুলকে ডাক্তার প্রথমে ওষুধ দেননি। কিন্তু স্কুল শুরু হওয়ার পর যখন স্কুলে খুব ঝামেলা হতে শুরু করল, তখন মনযোগ বাড়ানোর জন্য মিথাইলফেনিডেট দেওয়া হল। পরে অবসাদ কমানোর জন্য ফ্লুঅক্সেটিন আর রাগ কমানোর জন্য রিসপেরিডন-ও যোগ হয়েছে। গরমের ছুটি পড়ার আগে বছরের শেষ কয়েকটা সপ্তাহ রাহুল স্কুলে খুব ভালো ছিল, কথা শুনেছে, মন দিয়ে কাজ করেছে। মনে হয়, সারা বছর নানা রকম চেষ্টার পর ওষুধের মাত্রা শেষ পর্যন্ত ঠিক পড়েছে।

এ ছাড়া, আর একটা জিনিসও কার্যকরী হয়েছে। ওর বিহেভিয়ার থেরাপিস্ট স্কুলের টিচারদের সঙ্গে অনেক বার কথা বলে ওর জন্য স্কুলে আলাদা কী ব্যবস্থা করা যায়, তার পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন ওর পকেটে একটা খাতা থাকে। তাতে ওর যা কিছু নিয়ে চিন্তা, সেই সঙ্গে ওর স্কুলের নানা নিয়ম লেখা রয়েছে। ও মাঝখানে ভয় পাচ্ছিল যে, ও হয়তো স্কুলে লাঞ্চ খেতে পাবে না, তখন ওর খাতায় লিখে দেওয়া হল ‘‘আমি স্কুলে রোজ খাবার পাব’’। খাতার লেখা ও রোজ একবার করে স্কুলে পড়ে। তা ছাড়া ওকে স্কুলে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, দিনে দু’বার একজন টিচারের কাছে গিয়ে ১০-১৫ মিনিট করে ওর মাথায় যা কিছু চিন্তা, তাই নিয়ে কথা বলার। অন্য কোনও সময়ে যদি সেই চিন্তাগুলো ওর মাথায় ঢুকে কাজের ব্যাঘাত ঘটায়, তা হলে ও একটা কাগজে সেটা লিখে একটা বাক্সের মধ্যে জমিয়ে রাখতে পারে। তার পর কথা বলার সময় হলে বাক্সে যত কাগজ জমেছে, সেগুলো নিয়ে গিয়ে কথা বলতে পারে। বছরের শেষ কয়েকটা সপ্তাহ রাহুল সাধারণ অংকের ক্লাসে যেতে পেরেছে। আগামী বছর যদি ও স্কুলে কথা শোনে, ভালো থাকে, তা হলে আমরা আশা করছি যে, ও অন্য কিছু সাধারণ ক্লাসেও যেতে পারবে। স্কুলে ভালো থাকা ছাড়াও রাহুলকে ওষুধ দেওয়ার আর একটা সুফল আমরা লক্ষ করেছি। ওর মনের নানা রকম দুশ্চিন্তা কমে যাওয়ার ফলে ও এখন ওর পরিপার্শ্ব সম্পর্কে অনেক বেশি সজাগ। ওর বারবার একই কথা বলার প্রবণতা অনেক কমে গিয়েছে।

আমরা যা শিখেছি

রাহুলের বড় হওয়ার গল্প থেকে নিশ্চয়ই পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, রাহুলকে সাহায্য করার জন্য আমরা কোনও বাঁধা পথ ধরে সংগঠিত ভাবে এগিয়ে যাইনি। অনেক সময়ই অন্ধকারে হাতড়ে একবার একটা জিনিস, আর একবার অন্যটা করেছি। সব সময় মনের জোর আর ধৈর্য বজায় রাখতে পারিনি। বহু সময় গভীর হতাশায় ভুগেছি, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করেছি, রাহুলকে বকেছি, মেরেছি। অনেক সিদ্ধান্ত হয়তো ভুল নিয়েছি। আমাদের প্রথম থেকে কি কোনও একটা বাঁধা থেরাপি (যেমন ABA) করানো উচিত ছিল? অত দিন রাহুলকে বাড়িতে রেখে পড়ানো কি ঠিক হয়েছে? আরও আগে ডা. গাজীউদ্দিনের কাছে যাওয়া উচিত ছিল কি? এ সব প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না। তবে একটা জিনিস মনে হয় আমরা ঠিক করেছি। কখনও হাল ছেড়ে দিইনি।

আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে যা শিখেছি, তার কয়েকটা কথা বলতে চাই :

সবচেয়ে বড় থেরাপিস্ট আমরা নিজেরাই। রাহুলকে যখন অনেক ছোটবেলায় একজন নামকরা স্নায়ুরোগবিদের কাছে নিয়ে

গিয়েছিলাম, উনি বারবার বলেছিলেন, রাহুলকে শেখানোর দায়িত্ব আমাদের। আমরা যেন স্কুল বা থেরাপিস্টের ওপর সব ভার ছেড়ে না-দিই। ওঁর সঙ্গে দেখা করার পর যখন আমি বাইরের ঘরে বসেছিলাম, উনি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে এসে কথাটা আমাকে আবার বলেছিলেন। এত বার বলেছিলেন বলে কথাটা তখন মনে দাগ কেটেছিল। এর অনেক দিন পর আমরা খ্যাতনামা অটিজম বিশেষজ্ঞ ডা. ক্যাথারিন লর্ডের লেকচার শুনতে গিয়েছিলাম। উনি বলেছিলেন, এখনকার পদ্ধতিতে অনেক ছোট বয়সে অটিজম রোগ-নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু বড় হতে হতে কে কতটা উন্নতি করবে, সেটা বলা যায় না। তবে দেখা গিয়েছে যে, যাদের বাবা-মা নিজেরা ছেলেমেয়ের জন্য অনেকটা সময় দেন, তারা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে যায়। একজন অটিস্টিক বাচ্চার বাবা-মা তার সঙ্গে খেলা করেন, কথা বলেন, বেড়াতে নিয়ে গিয়ে, বাড়ির কাজে তাকে সঙ্গে নিয়ে নানা ভাবে তার সঙ্গে সময় কাটাতে পারেন। প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তেই প্রচুর সুযোগ রয়েছে তাকে সামাজিক আদানপ্রদানের অভ্যাস করানোর, বা নতুন কিছু শেখানোর। তবে সেটা করতে হবে তাকে চেপে ধরে, জীবন দুর্বিষহ করে নয়, খেলার ছলে, হালকা মেজাজে, তার ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে গুরুত্ব দিয়ে। প্লে-থেরাপির মূল বক্তব্য এটাই। এর ওপর ভিত্তি করে অনেকগুলো interven-

tion তৈরি হয়েছে, যেমন, DIR/Floortime (http://www.icld.com/DIRFloortime.shtml)। তবে আমরা একে দেখতে পারি এক রকম সম্পূর্ণ জীবনদর্শন হিসেবে।

সত্যিই কোনও সমস্যা আছে কি না, জানার জন্য অপেক্ষা করবেন না। আমার একটাই আফশোস, রাহুলের দুই থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যে ওকে বেশি সময় দিইনি। ও একা নিজের মনে খেলা করে যেত, আমি আমার কাজ করতাম। ''বিরক্ত'' করছে না বলে খুশিই হতাম। দু'বছর বয়সে যখন ও প্রথম কথা বলা কমিয়ে দিল, তখন ওর সঙ্গে বেশি করে কথা বললে, খেলা করলে ও নিশ্চয়ই এতটা পিছিয়ে পড়ত না। একজন শিশুর জীবনে একটা বছর অনেকটাই সময়। সেই একটা বছর, যখন আমরা নিশ্চিত ভাবে জানতাম না যে ও স্বাভাবিক ভাবে বাড়ছে না, আমরা হেলায় হারিয়েছি।

সব রকম থেরাপি থেকেই আমরা কিছু-না-কিছু শিখতে পারি। প্লে-থেরাপির কথা তো আগেই বলেছি। ডা. স্ট্যানলি গ্রিনস্প্যানের বই "The Child with Special Needs" আর "Engaging Autism" পড়লে এ বিষয়ে অনেক কিছু জানা যাবে। এর প্রায় উলটো রকমের থেরাপি হচ্ছে Applied Behavioural Analysis (ABA)।এটা অনেক পুরনো থেরাপি এবং অনেকের মতে খুবই কার্যকরী। এতে শিশুর আবেগ, ইচ্ছে, আত্মসম্মানবোধ এই সব নিয়ে মাথা ঘামানো হয় না। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোনও একটা কাজকে ছোট ছোট ধাপে ভাগ করে একটু একটু করে শেখানো। অনেকে প্লে-থেরাপি আর ABA-কে প্রতিযোগী মনে করে, কোন্‌টা ভালো, তাই নিয়ে অনেক তর্ক চলে। আমার মতে, এই দুই রকম ভাবনারই প্রয়োজন রয়েছে। আমরা প্লে-থেরাপি বা ABA কোনওটাই রাহুলকে করাইনি, অনেক খরচের ব্যাপার বলে পিছিয়ে গিয়েছি। ওর যদি সাধারণ ভাবে ক্রমশঃ উন্নতি না-হত, তা হলে হয়তো করানোর কথা ভেবে দেখতাম। তবে ডা. স্ট্যানলি গ্রিনস্প্যানের বই পড়ে প্লে-থেরাপির ভাবনাগুলো রাহুলের সঙ্গে মেলামেশায় কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। আর ABA -র মতো ধাপে ধাপে কিছু শেখানোর কার্যকারিতা রাহুলের বিহেভিয়ার থেরাপি দিয়েই উপলব্ধি করছি। ওর স্কুলে পকেটে খাতা রেখে বার বার পড়া, ওর দুশ্চিন্তাগুলো কাগজে লিখে রাখা, খুব রাগ বা দুঃখ হলে চেঁচামেচি থামিয়ে তিনবার নিঃশ্বাস নেওয়া এইসব ছোট ছোট ছকে বাঁধা জিনিস যে ওকে অনেকটাই সাহায্য করে, তা বুঝতে পারি। আর এক রকম থেরাপি নিজে শিখে রাহুলকে খানিকটা করিয়েছিলাম, তার নাম ফুয়েরস্টেইন ইন্স্ট্রুমেন্টাল এনরিচমেন্ট (Feuerstein Instrumental Enrichment -FIE) (http://www.icelp.org/asp/main.asp)।এর মূল ভাবনা হচ্ছে mediated learning, তার মানে কারও সাহায্যে শেখা। যে কোনও স্বাভাবিক শিশুকে একটা নতুন জায়গায় নিয়ে ছেড়ে দিলে সে নিজের থেকেই অনেক কিছু শিখে নেবে, স্পঞ্জের মত নতুন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে, সে নিজের থেকেই অনেক কিছু শিখে নেবে, স্পঞ্জের মতো পরিবেশ থেকে জ্ঞান শুষে নেবে। যে শিশুর অটিজম বা এইরকম কোন সমস্যা আছে, সে সাধারণত এটা পারে না। সে অন্যকে দেখেও শেখে না।তাকে হাতে ধরে সব কিছু শিখিয়ে দিতে হয়। ফুয়েরস্টেইন-এর মতে, মেধা হচ্ছে বিশেষভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা। মানুষের মেধা স্থিতিশীল নয়, ঠিকমত চিন্তা করতে শেখালেই যে কোনও শিশুর মেধাশক্তি বাড়বে। যেমন নতুন কিছু শিখলে একজন মেধাবী ছাত্র চট করে তার আগের শেখা অন্য জিনিসের সঙ্গে এর যোগ কোথায় বুঝে যাবে। যে শিশুর কোন সমস্যা আছে তাকে শেখাতে হবে কি করে নতুন শেখা কোনও জিনিসের সঙ্গে অন্য কিছুর যোগ স্থাপন করা যায়। ফুয়েরস্টেইন- এর তৈরি বিশেষ থেরাপি না করালেও এই ভাবনাগুলো কাজে লাগানো যায়। আরও অনেকরকম থেরাপি আছে যেমন ---

Relationship Development Intervention (RDI)

(http://autism.about.com/od/treatmentoptions/a/RDI. htm)

বিশেষজ্ঞদের সাহায্য অপরিহার্য তবে তাদের সব কথা নির্ভুল নয়। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আমাদের মিশ্র অভিজ্ঞতা আগেই বলেছি। এখন মনোরোগবিদ, বিহেভিয়ার থেরাপিস্ট, স্পিচ থেরাপিস্ট আর অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের কাছে যা সাহায্য পাচ্ছি, তার জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ। কয়েক বছর কারও সাহায্য ছাড়া চলার চেষ্টা করে বুঝেছি সেটা কতটা কঠিন আর কতটা বোকামি। বিশেষজ্ঞদের বিশেষ জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার একটা মূল্য আছে, যা কেবল ভালোবাসা আর সদিচ্ছা দিয়ে পূরণ করা যায় না। তবে তাদের সব কথা বেদবাক্য বলে মেনে নেওয়াও উচিত নয়। যতই হোক আমার ছেলে বা মেয়েকে আমিই সবচেয়ে ভালো চিনি। কেউ যদি এমন কোনও কথা বলে যা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না, তবে সেই কথাটা যুক্তিযুক্ত কিনা ভাল করে যাচাই করে নেওয়ার দায়িত্ব আমারই। যে মনস্তত্ত্ববিদ রাহুলকে মেন্টাল রিটার্ডেশন রোগ-নির্ণয় করেছিলেন, আমরা যদি তার কথা মেনে নিয়ে সবরকম চেষ্টা ছেড়ে দিতাম, তা হলে

রাহুলের পক্ষে মঙ্গল হত না।

আত্মীয়-বন্ধুদের সাহায্য নিলে বোঝা অনেক হালকা হয়। একজন অটিস্টিক শিশুকে মানুষ করা ম্যারাথন দৌড়ের মতো কঠিন আর দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ। এতে যদি কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, তার সাহায্য নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। অনেকে অটিজম বা এই ধরনের কোন রোগ-নির্ণয়ের সম্মুখীন হয়ে নিজেকে গুটিয়ে ফেলেন, সামাজিক আসা-যাওয়া কমিয়ে ফেলেন কিংবা নিজের সমস্যা অন্যের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। এতে কষ্ট বাড়ে আর একটা কঠিন সমস্যা দ্বিগুণ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সবাইকে সব কিছু বলার প্রয়োজন নেই, কিন্তু অন্তত কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে সঙ্গে রাখা উচিত। আমাদের কয়েকজন বন্ধু রাহুলের ছোটবেলা থেকে আমাদের পাশে থেকেছেন। তাঁরা রাহুলের সঙ্গে কথা বলেছে, খেলা করেছেন, পড়িয়েছেন, বেড়াতে নিয়ে গিয়েছেন, আমাদের সঙ্গে ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন, রাহুল কী করছে, না-করছে নিয়মিত তার খবর রেখেছেন, দরকার মতো পরামর্শ দিয়েছেন, দরকার মতো অপ্রিয় কথা বলতেও ভয় পাননি। ওঁরা না-থাকলে রাহুল কিছুতেই এতটা উন্নতি করতে পারত না।

আপনার সন্তানকে অনেক কিছু দেখার বা জানার সুযোগ দিন। যে কোনও স্বাভাবিক শিশুর খেলার অনেকটা জুড়ে থাকে কল্পনা। অটিস্টিক বাচ্চাদের সাধারণত কল্পনার দৌড় খুবই কম। তারা সত্যি যা দেখেছে, শুনেছে তার বাইরে বিশেষ কিছু ভাবতে পারে না। বারবার একই রকম কথা বলে, এক রকম খেলা খেলে, একই চিন্তাকে ঘিরে তাদের মন ঘুরপাক খায়। এই রকম শিশুকে নানা জায়গায় বেড়াতে নিয়ে গেলে, নানারকম কথা বললে, নানা জিনিস নিয়ে খেলতে দিলে তার মনের পরিব্যপ্তি ঘটে, তার সঙ্কীর্ণ মনোজগতের গন্ডি খানিকটা বাড়ে।

আপনার সন্তানের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করুন। অটিস্টিক বাচ্চারা সাধারণতঃ সব কিছুতে ভালো বা খারাপ হয় না। প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু গুণ থাকে। রাহুল অন্য সব কিছুর তুলনায় অংক ভালো পারে। কেউ কেউ ভালো ছবি আঁকতে পারে, কেউ ভালো গান গায়। আমরা সাধারণতঃ চেষ্টা করি, একটা শিশু যা পারে না, তার ওপর জোর দিতে। রাহুলের ভাষাজ্ঞানে দুর্বলতা আছে বলে ভাষা শেখানো নিয়ে আমরা অনেকটা সময় কাটাই। কিন্তু ওর আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য ও যা ভালো পারে, সেদিকেও নজর দেওয়াটা খুবই জরুরি।

আপনার ছেলে বা মেয়ের সম্ভাব্য উন্নতির ওপর কোনও সীমারেখা টেনে দেবেন না। আগে থেকে ধরে নেবেন না সে ভবিষ্যতে কী পারবে বা না-পারবে। এই কথাটা আমার নয়, ডা. স্ট্যানলি গ্রিনস্প্যানের। একটি শিশুর ওপর চাপ সৃষ্টি করা যেমন উচিত নয়, তেমনই, সে কোনও একটা কিছু পারবে না, তা আগে থেকে ধরে নেওয়াটাও অন্যায়। আপনি যদি মনে মনে ভাবেন, আপনার মেয়ে কোনও দিন পড়তে শিখবে না, সেটা তাকে না-বললেও, সে ঠিকই বুঝতে পারবে আপনার চোখের দৃষ্টিতে, গলার স্বরে।

আপনি যত না-কষ্ট পাচ্ছেন, আপনার ছেলে বা মেয়ে কষ্ট পাচ্ছে তার অনেক গুণ বেশি। বাবা-মা হিসেবে আমাদের মনে রাখতে হবে, সমস্যাটা আমাদের নয়। এর মানে আমার ছেলের অটিজমের জন্য আমি নিজে যতই দুঃখ পাই, কষ্ট করি বা লজ্জায় পড়ি, সেটা ওর কষ্টের তুলনায় কিছুই নয়। এই সহজ কথাটা ভুলে যাই বলে আমাদের বারবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে আর সহানুভূতি দেখানোর বদলে বকাবকি করি।

অটিজম এমন একটা অসুখ, যার কারণ জানা নেই, যার বর্তমানে কোনও চিকিৎসা নেই, যা শিশুর বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রূপ বদলায়। তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে একজন অটিস্টিক শিশুর বাবা-মাকে তাদের সমস্ত শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ক্ষমতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। আমরা, রাহুলের বাবা-মা, সব সময় এক রকম মানসিক ওঠা-পড়ার মধ্যে থাকি। রাহুল নতুন কিছু শিখলে উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আবার যখন একদিন রাহুল স্কুলে টিচারকে মেরেছে বলে আগে বাড়ি নিয়ে আসতে হয়, তখন হতাশায় ডুবে যাই। মনে হয় আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। এই সব ওঠা-পড়া কিন্তু সাময়িক। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলে বুঝতে পারি, রাহুল হঠাৎ করে কোনও উন্নতি করেনি, করবেও না, ওর অটিজম কখনও ভালো হয়ে যাবে না। আবার এটাও ঠিক যে, একটু একটু করে ও যেখানে ছিল, সেখান থেকে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। এই লেখার প্রথমে রাহুলের যে ছবি এঁকেছি, তা কেবলমাত্র আজকের রাহুলের। চার বছর আগে রাহুল এর অনেক কিছুই করতে পারত না। আর, আমার বিশ্বাস, চার বছর পর রাহুল আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে, এমন অনেক কিছু পারবে, যা, এখন আমাদের কল্পনার বাইরে।

শ্রীলা দত্ত, আমেরিকায় প্রবাসী পদার্থবিদ, রাহুলের মা।

যোগাযোগ- sreela2000@yahoo.com